HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০১ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা
টপিক ০২: সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩: সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ
টপিক ০৪: সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ
টপিক ০৫: সামাজিক অসমতার ধারণা
টপিক ০৬: সামাজিক অসমতার উৎপত্তি
টপিক ০৭: সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ
টপিক ০৮: জেন্ডার ধারণা
টপিক ০৯: নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা
টপিক ১০: জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব
টপিক ১১: বয়সবৈষম্যবাদ ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
টপিক ১৩: বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ
টপিক ১৪: সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা
টপিক ১৫: সামাজিক নিরাপত্তার উপায়
টপিক ১৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি সমাজে সমাজে দেখা যায় নানাবিধ স্তরবিন্যাস। অর্থসম্পদ, মেধা, পেশা, বংশ, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, ক্ষমতাসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে সমাজ আজ স্তরীভূত। স্তর বা শ্রেণিবিহীন সমাজের অস্তিত্ব পৃথিবীর কোথাও নেই। দাস সমাজে দাস ও মনিব শ্রেণির অস্তিত্ব, সামন্ত সমাজে জমিদার ও ভূমিহীন কৃষক শ্রেণির অস্তিত্ব, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণির অস্তিত্ব খুবই সুস্পষ্ট। তাছাড়া সমতার অস্তিত্ব কোনো সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না বললেই চলে। আইনের চোখে ও নৈতিকতার দিক থেকে সবাই সমান- এটি তত্ত্বগতভাবে সত্য হলেও বাস্তবে এর নজির আমরা কোনো সমাজেই দেখতে পাই না।

অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

স্তর শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Strata শব্দটি মাটি বা শিলার বিভিন্ন স্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সমাজের উঁচু-নীচু বা ক্রমানুযায়ী বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বোঝাতেও Strata শব্দটি ব্যবহৃত হয়। স্তরবিন্যাস বলতে বোঝায় স্তরগুলোর সুস্পষ্ট ও সুসজ্জিত বিন্যাস। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষের গোষ্ঠী, শ্রেণি, বয়স, শিক্ষা, ক্ষমতা বা মর্যাদার দিক দিয়ে সুসজ্জিত ক্রমিক অবস্থান।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

সামাজিক স্তরবিন্যাসকে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন-

সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন (Sorokin) তার 'Contemporary Sociological Theories' গ্রন্থে বলেন, "Social stratification is the differentiation of the given population into hierarchically arranged classes. It means the existence of higher and lower strata. Its basis and true essence consist in an unequal distribution of rights and privileges, duty and responsibility, social riches and scantiness, social power and influence among the members of society." (উঁচু-নীচু শ্রেণির ক্রমানুসারে সংগঠিত জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতাই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস। এর অর্থ সমাজে উঁচু-নীচু সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। উঁচু-নীচু সামাজিক স্তরের ভিত্তি হলো সমাজের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, দায়িত্ব-কর্তব্য, প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অসম বণ্টন)।

মেরিল (Merril) তার 'Society and Culture' নামক গ্রন্থে বলেন, "Social stratification involves a system of differential privileges, which means that some groups receive more of the goods, services, power and emotional gratification of the society than others." অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সুযোগের অসম বণ্টন ব্যবস্থাকে বোঝায়। যার অর্থ সমাজের কতিপয় গোষ্ঠী সমাজের যা কিছু ভালো, সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ইত্যাদি সমাজের অন্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় ভোগ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

অগবার্ন ও নিমকফ (Ogburn & Nimkoff) 'Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "The process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status is known as stratification." (স্তরবিন্যাস হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মোটামুটি স্থায়িভাবে উঁচু-নীচু মর্যাদার ক্রমানুসারে সাজানো হয়।)

কার্ল মার্কস (Karl Marx) সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্য প্রধানত অর্থনৈতিক কারণকেই দায়ী করেছেন। তবে তিনি এর সাথে আরও দুটি কারণ যোগ করেছেন। যথা- ১. ক্ষমতা ও ২. খ্যাতি।

পি. জিসবার্ট (P. Gisbert)-এর মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো প্রাধান্য ও বশ্যতার সূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত স্থায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণিতে সমাজের স্তর বিভাগ।

টি. বি. বটোমোর (T. B. Bottomor) বলেন, "Social stratification is the division of society into classes or strata, which form a hierarchy of prestige and power." (সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের শ্রেণি বা স্তরভিত্তিক বিভাজন, যা মর্যাদা ও ক্ষমতা গঠন করে।)

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver and Page)-এর মতে, "সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো মর্যাদাভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর উর্ধ্ব বিভাগ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস, যা মোটামুটি স্থায়ী ব্যবস্থা।"

সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স (Talcott Parsons) তার 'Social Structure and Personality' গ্রন্থে সামাজিক দিক থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে উর্ধ্বতন-অধস্তন বা উঁচু-নীচু বিবেচনার ভিত্তিতে প্রভেদমূলক পদবিন্যাস সৃষ্টি করাকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বলেন।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী টিউমিন মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রাচীনত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যানুযায়ী প্রাচীন সমাজস্থ মানুষ এমনকি ক্ষুদ্র যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে স্তরবিন্যাস ছিল।

২. এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবহমান। তাই একে সামাজিক বিন্যাস বলা হয়।

৩. সামাজিক স্তরবিন্যাস সার্বজনীন প্রাচীন শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। তাই বিশ্বের সব দেশেই এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশেও স্তরায়ন রয়েছে।

৪. এটি স্থান-কালভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যাকে বলা হয় বহুরূপিতা।

৫. স্তরবিন্যাসের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এটি প্রধানত জীবন সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠান, জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ এ চারটি ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা

কিংসলে ডেভিস ও উইলবার্ট মুর (Davis and Moore)-এর মতে, "কাজের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ সেটাই সামাজিক স্তরবিন্যাস।"

চিনয় (Chinoy) বলেন, "প্রতিটি সমাজে কতিপয় ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট এবং কতিপয়কে নিকৃষ্ট বলে শনাক্ত করা হয়। কেউ শাসন করে, অন্যেরা শাসিত হয়। এভাবে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীন শ্রেণির উদ্ভব হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী K. B. Meyer তার 'Class and Society' গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে সমাজের মানুষকে উঁচু, সমান ও নীচু ইত্যাদি স্তরে বিভক্ত করা।"

সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সামাজিক শ্রেণির ক্রমানুযায়ী অবস্থান। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণিসমূহকে স্তরায়িত করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০২ সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

মূলত সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি বলতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। কেননা যেকোনো বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বলতে সেই বিষয়ের বিষয়বস্তুর স্বভাব, পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যাবলি হলো-

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি সমাজভেদে ভিন্ন সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি সমাজভেদে শ্রেণি বা স্তরের উৎপত্তি ভিন্ন হয়। বহু বিচিত্র কারণে মানমর্যাদার ভিত্তিতে এ ভিন্নতার সৃষ্টি হয়। যেমন- শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

২. সকল সমাজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বিরাজমান মূলত সামাজিক স্তরবিন্যাস সার্বজনীন বিষয়। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন (Sorokin) তার 'Social Mobility' গ্রন্থে বলেছেন, সকল স্থায়ী সমাজব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক স্তর রয়েছে। যেমন- প্রাচীন রোমান সমাজের রাজা অভিজাত, দার্শনিক, বড় ব্যবসায়ী, বৃহৎ জমির মালিক, প্রজাগণ এবং সৈনিক পুরুষরা ছিল উচ্চশ্রেণিভুক্ত। ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর ও অল্প জমির মালিকরা ছিল মধ্যশ্রেণি। আর কৃষক ও দাসরা ছিল নিম্নশ্রেণির। অতএব বলা যায়, পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস অনুপস্থিত।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

৩. স্তরবিন্যাস মূলত মানবিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাস: সামাজিক পদমর্যাদার অবস্থান নির্ণয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্তরবিন্যাসের জৈবিক উপাদান হলো- বয়স, লিঙ্গ, উচ্চতা, শক্তি, নরবংশ ইত্যাদি। মূলত এগুলো সমাজের সদস্যবৃন্দের বিচারে তা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। সমাজ বয়স উপাদানটিকে গুরুত্ব দেয় বলে বয়সের মাধ্যমে মানুষের পদমর্যাদায় ভিন্নতা আসে। যেমন- একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক তার মর্যাদায় আসীন হন তার বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা ও উপযুক্ততা যাচাইয়ের মাধ্যমে, শারীরিক শক্তি বা বয়সের মাধ্যমে নয়। তাই বলা যায়, সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো মানবিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাস।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

৪. সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে: সাধারণত একই স্তরভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয়। যেমন- বৈবাহিক সম্পর্ক, বৃত্তি নির্বাচন, বন্ধুত্ব স্থাপন প্রভৃতি সাধারণত সমস্তর ও সমমর্যাদার ব্যক্তিদের মধ্যে হয়ে থাকে। মূলত স্তরের একটি অন্তর্মুখী মনোভাব আছে। এ ধরনের মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কঠোর ও কার্যকর।

৫. স্তরবিন্যাসের ভিন্নতা একেক সমাজে একেক রকমের স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। আর এ ভিন্নতার উপাদানগুলো হলো বয়স, লিঙ্গ, দক্ষতা, আয়, উচ্চতা, পেশা, পদমর্যাদা, পারদর্শিতা ইত্যাদি।

৬. স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরন ও মাত্রা: একেক সমাজের অসমতার প্রকৃতি বা ধরন ও মাত্রা একেক রকম হয়ে থাকে। এ ভিন্নতার ফলে সমাজে স্তরবিন্যাস দেখা দেয়।

৭. সমাজকাঠামোর মূলকথা হলো স্তরবিন্যাস: মূলত সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণে একটি অন্যতম কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সামাজিক বিন্যাস পর্যালোচনাকে। মূলত সমাজকাঠামোর বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সমাজকাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক স্তরবিন্যাস।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

৮. সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্তরবিন্যাস সমাজের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকায় অর্থ, খাদ্য, পোশাক, সংস্কৃতি এবং চিত্তবিনোদনমূলক কাজকর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির বিভিন্নতা রয়েছে। এছাড়াও সমাজজীবনে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন- বিবাহ, অসুস্থতা, দাম্পত্য জীবনে অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশুমৃত্যু ইত্যাদির সঙ্গে সামাজিক শ্রেণি বা মর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে।

৯. স্তরবিন্যাস ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি: প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এম. এম. তুনিন (M. M. Tunin) তার 'Social Stratification' গ্রন্থে বলেছেন, স্তরবিন্যাস ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি। যদিও অনেকে স্তরবিন্যাসকে একটি সার্বজনীন হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১০. সংস্কৃতি স্তরবিন্যাসকে প্রতিফলিত করে সমাজবিজ্ঞানী এম. এম. তুনিন (M. M. Tunin)-এর মতে, "সামাজিক স্তরবিন্যাস সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।" সংস্কৃতি বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য

এছাড়াও সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সার্বজনীন ও চিরন্তন।
২. সামাজিক মান ও রীতির নিয়ামক হলো সামাজিক স্তরবিন্যাস।
৩. এটি সামাজিকীকরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।
৪. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে।
৫. সকল সমাজে স্তরবিন্যাস থাকলেও এর প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়।
৬. সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনধারণের প্রণালিকে প্রভাবিত করে সামাজিক স্তরবিন্যাস।
৭. এটি হলো মর্যাদাভিত্তিক বিন্যাস।
৮. মূলত সামাজিক স্তরবিন্যাসের উদ্ভব হয় সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদার বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৩ সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি রূপ বা প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। যা ছকের মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখানো হলো—

ছক : সামাজিক স্তরবিন্যাস

১. দাসব্যবস্থা,
২. সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থা,
৩. জাতি-বর্ণপ্রথা, পদমর্যাদা ব্যবস্থা ও
৪. সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

দাসব্যবস্থা

দাসব্যবস্থা পৃথিবীর প্রাচীন শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। আদিম সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই দাসব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। শিকার ও ফলমূল সংগ্রহভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পরে মানুষ যখন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় পদার্পণ করে তখন তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা জন্ম নেয়। ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা থেকেই দাসব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। দাসব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে গ্রিক ও রোমান সভ্যতায়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল দাসপ্রথাকে সমর্থন করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন। এরিস্টটল দাসদেরকে উৎপাদনের জীবন্ত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তার 'The Politics' গ্রন্থে দাসদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, "সমাজে কিছু লোক আছে যারা প্রজ্ঞার অধিকারী এবং এ প্রজ্ঞার বলে তারা শুধু আদেশ প্রদানেই সক্ষম। পক্ষান্তরে, সমাজে বেশিরভাগ লোক আছে যারা শুধু দৈহিক বলে বলীয়ান এবং দৈহিক বলের কারণে তারা শুধু কায়িক পরিশ্রমে সক্ষম। প্রজ্ঞার অভাব থাকায় তারা আদেশ প্রদানে অক্ষম, তাদের একমাত্র যোগ্যতা প্রজ্ঞাবানের আদেশ মান্য করে তদনুযায়ী কাজ করা।" তার মতে, প্রথম শ্রেণির লোকেরা হচ্ছে প্রভু যারা সমাজের মঙ্গল চিন্তা করবে আর দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা হচ্ছে দাস যারা মনিব বা প্রভুর সেবা করবে। প্রভুরা যুক্তি বা আত্মার প্রতিনিধি আর দাসরা লালসা বা দেহের প্রতিনিধি।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

দাসব্যবস্থা

এল. টি. হবহাউস (L. T. Hobhouse) দাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "দাস হচ্ছে এমন একজন মানুষ যাকে আইন এবং প্রথা অন্যের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত করে। চূড়ান্ত বিচারে সে যাবতীয় অধিকারবিহীন বিশুদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি। অন্যদিকে, সে কিছু নির্দিষ্ট অধিকার সংরক্ষণ করত; কিন্তু এটি অনেকটা ষাঁড় বা গাধার মতোই।"

বি. ভূষণ (B. Bhushan) তার 'Dictionary of Sociology' নামক গ্রন্থে দাসদেরকে সম্পত্তির ধরন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাসব্যবস্থাকে সম্পত্তির একটি ধরন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা একজনকে অন্যজনের ওপর মালিকানা আরোপের অধিকার দেয়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মতো দাসও একটি বস্তু।"

দাসব্যবস্থা একটি অর্থনৈতিক সম্পর্কনির্ভর সমাজব্যবস্থা। মার্কসের মতে, এটিই প্রথম শ্রেণিভিত্তিক শোষণমূলক সমাজ। দাসব্যবস্থায় দাস ও দাসপ্রভু নামে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান। তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। দাস হচ্ছে মালিকের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। দাসদের ওপর দাস-মালিকের অধিকার দাবির পিছনে আইন এবং সমাজের সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল। দাস-মালিকরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে দাসদের কেনাবেচা করতেন। দাস এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। দাস-মালিকরা যা আদেশ করতেন, দাসরা তা মানতে বাধ্য ছিল। দাসদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। সেবা ও রক্ষা নামক সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রচলিত ছিল এ দাস সমাজব্যবস্থা।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

দাসব্যবস্থা

দাসপ্রথাকে বিশ্লেষণ করলে এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন-

দাসেরা মনিবের অধীনস্থ থাকে। দাসের ওপর মনিবেরা সীমাহীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। দাস হচ্ছে মনিবের দখলকৃত বস্তু বা সম্পত্তি। সামন্ত যুগের ফ্রিম্যানদের সাথে তুলনা করলে দাসদের অবস্থান অনেক নিচে। তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নেই। তারা কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। এজন্য সরকার বা শাসক নির্বাচন করার ক্ষমতা থেকেও তারা বঞ্চিত।

দাসদের ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা নেই। তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। মনিবেরা যা আদেশ করে তারা তা মানতে বাধ্য। এদেরকে পণ্যের মতো কেনাবেচা করা হতো। ইচ্ছা করলেই তারা তাদের কাজ থেকে ইস্তফা দিতে পারত না। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে দাস হয়েই বেঁচে থাকতে হতো।

দাসব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক। এদের পেশা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হতো। দাসব্যবস্থায় দাসদেরকে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হতো। অনেকে দাসব্যবস্থাকে শিল্পব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু কেউ কেউ দাসদের শ্রমকে অনুৎপাদনশীল বলে আখ্যায়িত করেছে। এজন্যই দাসব্যবস্থার পতন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থা

সভ্যতার বিবর্তনে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরেকটি ধরন হচ্ছে এস্টেট ব্যবস্থা। এস্টেট ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে। এজন্য এস্টেট ব্যবস্থা বলতে অনেকে সামন্ত ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু Estate শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জমিদারের মালিকানাধীন জমি। ভূমিই ছিল ইউরোপীয় মধ্যযুগের ক্ষমতা ও মর্যাদার উৎস। সামন্ত জমিদারগণ বিশাল ভূমির মালিক ছিল। এ বিশাল ভূমি এলাকাই ছিল তাদের Estate। এ এলাকার মধ্যেই তাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সব জিনিস উৎপন্ন হতো। সামন্ত যুগে সেবা ও রক্ষা নামক সামাজিক চুক্তি ছিল।

B. Bhushan এস্টেট প্রসঙ্গে বলেন, "এস্টেট প্রথা হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ব্যবস্থা, অনেকটা বর্ণপ্রথার মতো, যা ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপ ও রাশিয়ায় পরিলক্ষিত হতো এবং ক্ষুদ্রসংখ্যক স্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য ও অনমনীয় প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।"

মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যক্তির মর্যাদা জন্মগতভাবেই নির্ধারিত ছিল। সমাজস্থ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সামাজিক স্তর আইনের মাধ্যমে জন্মগতভাবেই বণ্টন করা হতো। সমাজে তিন ধরনের শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। যথা- ১. যাজক শ্রেণি- প্রথম এস্টেট (The Clergy), ২. ভূমি মালিক বা অভিজাত শ্রেণি-দ্বিতীয় এস্টেট (The Nobility) ও ৩. সাধারণ বা ভূমিদাস শ্রেণি-তৃতীয় এস্টেট (The Commoners) ।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থা

টি. বি. বটোমোর (T. B Bottomore) তার 'Sociology' গ্রন্থে এস্টেট সম্পর্কে বলেন, "অভিজাত শ্রেণি সবার ভাগ্যের নিরাপত্তা বিধান করে, যাজক শ্রেণি সবার জন্য প্রার্থনা করে এবং সাধারণ শ্রেণি সবার খাদ্য সরবরাহ করে।"

সমাজ পরিচালনায় অন্য শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অভিজাত শ্রেণি মূল ভূমিকা পালন করত। সাধারণ শ্রেণি অভিজাতদের অধীনস্থ কর্মচারীর মতো ছিল। এস্টেটভুক্ত মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সামাজিক স্তর আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। তখন ব্যক্তির মর্যাদা ও ক্ষমতা আইনের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

Biezanz & Biezan তাদের 'Introduction to Sociology' গ্রন্থে এস্টেট প্রথা প্রসঙ্গে বলেন, "সামাজিক স্তরবিন্যাসের এস্টেট ব্যবস্থা ভূমিভিত্তিক বংশানুক্রমিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল এবং এভাবে এটি কৃষিভিত্তিক সমাজ ও ন্যূনতম শ্রমবিভাজনের জন্য সর্বাধিক উপযোগী।"

সুতরাং এস্টেট ব্যবস্থা ও সামন্তপ্রথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সামন্তব্যবস্থার মধ্যে জমিদার, যাজক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের ক্রমোচ্চ সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রাতিষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে এস্টেট প্রথা।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থা

এস্টেট প্রথাকে বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন-

প্রতিটি এস্টেটের ক্ষমতা ও মর্যাদা আইনের দ্বারা নির্ধারিত ছিল। এস্টেটভুক্ত মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহ সামাজিক স্তর আইনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ছিল। কোনো ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রথমেই আইন অনুযায়ী তার মর্যাদা কোথায় তা জানতে হতো।

ইংরেজ আইনজীবী Glanville-এর মতে, ভূমিদাস বিচারের জন্য রাজার কাছে কোনো ধরনের অভিযোগ করতে পারত না, সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না এবং বিভিন্ন কারণে তাদেরকে জরিমানা করা হতো। বিভিন্ন এস্টেটে ভূমিদাসরা বিভিন্ন মাত্রার অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করত। ভূমিদাসদের অত্যাচার ও নির্যাতনের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন এস্টেটের মধ্যে পার্থক্য করা হতো।

এস্টেট প্রথার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শ্রমবিভাজন। অর্থাৎ এস্টেটভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত ছিল। যেমন সামন্তপ্রভু ও অভিজাতদের কাজ ছিল মানুষের ভাগ্যের নিরাপত্তা বিধান করা, যাজক বা পাদ্রিদের কাজ ছিল সবার জন্য প্রার্থনা করা এবং সাধারণ জনগণের কাজ ছিল সবার জন্য খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

জাতি-বর্ণপ্রথা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম একটি রূপ হচ্ছে জাতি-বর্ণপ্রথা। জাতিবর্ণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Cust system । এ প্রথায় সদস্যপদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যার ভিত্তি হলো শুদ্ধ-অশুদ্ধ নিয়ম বিধি-ক্রমানুসারে সংগঠিত করা। বর্ণপ্রথার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Caste। এটি স্প্যানিশ শব্দ Casta থেকে এসেছে। যার অর্থ বংশধর, কুল বা জাতি বা বংশগত গুণের ভিত্তিতে বিশেষ কোনো মানবগোষ্ঠী। একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক অসমতাভিত্তিক জাতিভেদ প্রথাকে বোঝানোর জন্য পর্তুগিজরা Caste শব্দটি ব্যবহার করে। এটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা স্থিতিশীলতা, ব্যাপকতা ও প্রাচীনতার দিক থেকে ভারতীয় সমাজই জাতি-বর্ণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য সমাজেও বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন মিশর, জাপান, রোম এবং আধুনিক মায়ানমার, ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ণপ্রথার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এখনো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বর্ণপ্রথার প্রচলন রয়েছে। তবে এর উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই। ধারণা করা হয়, চার হাজার বছর পূর্বে যাযাবর আর্য হানাদারদের আধিপত্য বিস্তারের একটি ব্যবস্থা হিসেবে এর আবির্ভাব ঘটে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

জাতি-বর্ণপ্রথা

জন্মসূত্রে নির্ধারিত হিন্দু সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় স্তরবিন্যাস হচ্ছে জাতিবর্ণ প্রথা। A. Beteille তার 'Caste, Class and Power' নামক গ্রন্থে বর্ণপ্রথা সম্পর্কে বলেন, "বর্ণপ্রথাকে কিছু লোকের ক্ষুদ্র এবং নামবিশিষ্ট একটি দল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটি অন্তর্বিবাহ বংশধারার ভিত্তিতে সদস্যপদ এবং একটি সুনির্দিষ্ট জীবনধারার ভিত্তিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এটি মাঝেমধ্যে ঐতিহ্যবাহী সুনির্দিষ্ট পেশা অন্তর্ভুক্তির প্ররোচনা দেয় এবং স্বভাবতই কমবেশি স্বতন্ত্র কিছু অনুষ্ঠান, উঁচু-নীচু ক্রমানুসারে পদমর্যাদাকে সংগঠিত করার প্রয়াস পায়।"

T. B. Bottomore-এর মতে, বর্ণপ্রথা হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক বিভাজন। বর্ণপ্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন, "ভারতীয় বর্ণপ্রথা সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক অনন্য ব্যবস্থা। বর্ণপ্রথা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক পার্থক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। জাতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট। তারা পেশাভিত্তিক দলের অপরিহার্য অংশ। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ অর্থনীতিতে বর্ণপ্রথা দ্রব্য এবং সেবার বিনিময়ে ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে।"

T. H. Marshal-এর মতে, "The caste system is religious institution." অর্থাৎ বর্ণপ্রথা হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বর্ণপ্রথা সম্পর্কে B. Bhushan বলেন, "বর্ণপ্রথা হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের এমন একটি ধরন যার রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতায় একে অন্যের থেকে ক্রমানুসারে সংগঠিত এবং পৃথকীকৃত।"

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

জাতি-বর্ণপ্রথা

হিন্দুশাস্ত্রে চারটি বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো–

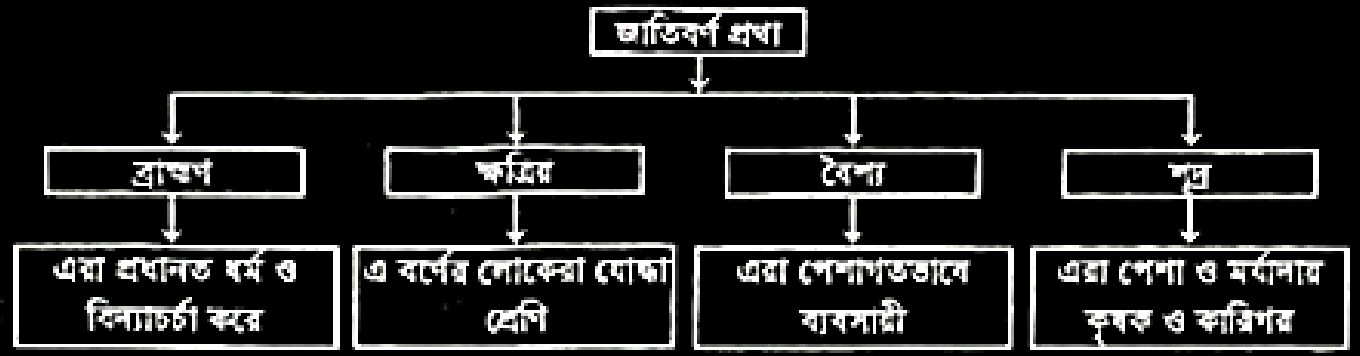

ব্রাহ্মণরা প্রধানত ধর্ম ও বিদ্যা চর্চা করেন। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা শ্রেণি হিসেবে পরিচিত। বৈশ্যরা হচ্ছে ব্যবসায়ী শ্রেণি। আর সবচেয়ে নীচুজাতের পেশাজীবী শ্রেণি হচ্ছে শূদ্র। বর্ণপ্রথায় ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সবকিছু পূর্বনির্ধারিত থাকে। জন্মগতভাবেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় ইচ্ছা করলেও ব্যক্তি তার জাত পরিবর্তন করতে পারে না। শূদ্র কখনো ব্রাহ্মণ হতে পারে না। বিবাহের ক্ষেত্রেও বর্ণপ্রথা মেনে চলা হয়। দুটি ভিন্ন জাতের মধ্যে সাধারণত বিয়ে হয় না। এ প্রসঙ্গে K. Davis তার 'Human Society' নামক গ্রন্থে বলেন, "বর্ণপ্রথায় সদস্যপদ হচ্ছে বংশগত। শিশু জন্মগতভাবেই তার মাতা-পিতার মর্যাদা গ্রহণ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ সদস্যপদ জীবনের জন্য নির্ধারিত। বিবাহের পাত্রপাত্রী পছন্দ কঠোরভাবে বর্ণগোত্রীয়।"

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

জাতি-বর্ণপ্রথা

হিন্দুদের বর্ণপ্রথা বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন-

জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জন্মসূত্রে সদস্যপদ লাভ করা। বর্ণপ্রথায় কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান জানতে হলে দেখতে হবে তার জন্ম কোন বর্ণে। এখানে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ভর করে তার বর্ণের ওপর। ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে তাকে আজীবন সেই বর্ণের পরিচয় বহন করতে হয়। ইচ্ছা করলেও সে বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি বর্ণপ্রথার নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অন্যকোনো বর্ণে বিবাহ না করে তাহলে তার সন্তান-সন্ততিও একই বর্ণের পরিচয় বহন করে।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এ বর্ণগুলো ধারাবাহিকভাবে জাতিবর্ণ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। ধারণা করা হয়, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম। ক্ষত্রিয় বর্ণের সৃষ্টি হয় ব্রহ্মার বাহু থেকে। ব্রহ্মার উরু থেকে জন্মলাভ করে বৈশ্য। আর শূদ্রদের সৃষ্টি করা হয় ব্রহ্মার পায়ের পাতা থেকে। এসকল বর্ণের মানুষের পেশা জন্মগতভাবে নির্ধারিত।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

জাতি-বর্ণপ্রথা

অতীতে হিন্দুধর্মে ব্যক্তির পেশা নির্ধারিত হতো বর্ণপ্রথা অনুযায়ী। তাই পেশা পরিবর্তন করা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া বর্ণপ্রথাকে শ্রমবিভাজন ব্যবস্থা বলে অনেকে যুক্তি দিয়েছেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের সুযোগের কথা বলে বর্ণপ্রথাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে বর্তমানে পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথা খুব একটা প্রভাব বিস্তার করে না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক নিম্নবর্ণের লোকও ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ বা আইনজীবী হচ্ছে।

বর্ণপ্রথার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ণভুক্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা। অর্থাৎ এক বর্ণের ব্যক্তি অন্য বর্ণের ব্যক্তির সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারত না। কেননা এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের মেলামেশার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো। যেমন- এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকের কাছ থেকে খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত। সাধারণত যারা নিজেদেরকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করত তারা তাদের দৃষ্টিতে নিম্নবর্ণের লোকদেরকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু বর্তমানে এ প্রবণতাও হ্রাস পাচ্ছে। বর্ণপ্রথা এখন আর মানুষের মেলামেশা বা বন্ধুত্বকে বাধাগ্রস্ত করে না।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরেকটি ধরন হচ্ছে সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা। সমাজবিজ্ঞানের একটি বহুল আলোচিত বিষয় হচ্ছে সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা। একই আয় ও সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো শ্রেণি। তবে এর উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, শ্রেণি বা Class শব্দটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে প্রাচীন রোমে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন রোমান অধিপতি Servius Tullius রোমান সেনাদের পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে রোমানরা শ্রেণি শব্দটি ব্যবহার করতেন। রাজস্ব কমবেশি প্রদানের ভিত্তিতে রোমান প্রজাদেরকে Assidui বা ধনী শ্রেণি এবং Proletari বা গরিব শ্রেণি নামে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণি শব্দের উৎপত্তিগত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মেসোপটেমিয়ায়, তৃতীয় শতকে গ্রিস ও চীনে, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতে শ্রেণি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে ডেভিড রিকার্ডো এবং অ্যাডাম স্মিথ শ্রেণি সম্পর্কে অনেক বেশি আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

তারা পুঁজিপতি, জমিদার ও শ্রমিক-এ তিন ধরনের শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন। আধুনিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস শ্রেণি শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহার করেন। তবে তিনি এর সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা প্রদান করতে পারেননি।

শ্রেণি সম্পর্কে T. B. Bottomore বলেন, "সামাজিক শ্রেণিগুলো হচ্ছে কার্যত বিভিন্ন দল। তারা তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত, বদ্ধ নয়। নিঃসন্দেহে তাদের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক, কিন্তু তারা অর্থনৈতিক দলের থেকেও বেশি কিছু।"

লেনিন শ্রেণি সম্পর্কে বলেন, "শ্রেণি হচ্ছে এমন কিছু গোষ্ঠী যারা একে অন্যের শ্রমের বিরোধিতা করে।"

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

H. Levy-Ullmann-এর মতে, সমাজের অন্যদের ওপর প্রভাব খাটাবার বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অভিপ্রায় থেকে শ্রেণিবিভাগের সৃষ্টি। তিনি মনে করেন, সমাজে মূল শ্রেণি দুটি। যথা- শাসক ও শাসিত। বিভিন্ন কারণেই সমাজে শাসক ও শাসিত নামে দুটি শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যের কারণে একটি আরেকটিকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করে।

ডেভিড পোপিনো (David Popenoe) তার 'Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক শ্রেণি হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা পালন দ্বারা নির্ধারিত গোষ্ঠী।"

B. Bhushan সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞায় বলেন, "সামাজিক শ্রেণি বলতে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের একটি বৃহৎ বিভাগ বা শ্রেণিকে বোঝায়, যারা তাদের সমাজ সম্প্রদায়ের অন্যান্য দলের সাথে সম্পর্কের আলোকে অভিন্ন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী।"

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণিকে অর্থনীতির বাইরে চিন্তা করেছেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী R. Centers সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, "সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থাকে যথাযথভাবেই মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।"

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

সমাজবিজ্ঞানীরা স্তরবিন্যাসের সাথে সম্পৃক্ত শ্রেণিকে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

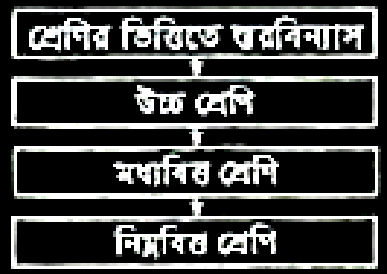

১. উচ্চশ্রেণি (Upper class), ২. মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle class) ও ৩. নিম্নবিত্ত শ্রেণি (Lower class)।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সমাজেই এ শ্রেণিগুলোর উপস্থিতি দেখা যায়। যাদের অনেক সম্পত্তি আছে তারা হচ্ছে উচ্চ শ্রেণির লোক। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা সমাজের শীর্ষে অবস্থান করেন। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির উপরে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব রাখেন। কিন্তু নিম্নবিত্তদেরকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে না। মধ্যবিত্তদের খুব বেশি সম্পত্তি নেই। কিন্তু তাদের যা আছে তা দিয়ে তারা নিজেরা মোটামুটি ভালোভাবেই চলতে পারে। তাদের অন্যের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর্থসামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে খুব বেশি উঁচুও নয়, আবার নীচুও নয়।

B. Bhushan মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে বলেছেন, "এটি সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার সেই অংশ যার ব্যতিক্রমী নিম্ন মর্যাদা বা ব্যতিক্রমী উচ্চ মর্যাদা নেই।" Gisbert মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা- উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত।

শ্রমজীবী মানুষ হচ্ছে নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের তেমন কোনো অর্থসম্পদ নেই। বিভিন্ন প্রয়োজনে তারা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য তারা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের দ্বারা বিভিন্নভাবে শোষিতও হয়। সামাজিক পদমর্যাদার দিক দিয়েও নিম্নশ্রেণির মানুষ সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে। সামাজিকভাবে এদেরকে কিছুটা অবহেলার চোখে দেখা হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

শ্রেণির বৈশিষ্ট্য: শ্রেণিব্যবস্থাকে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন-

শ্রেণিব্যবস্থায় সামাজিক মর্যাদা পূর্বনির্ধারিত থাকে না। জন্মের সাথে সম্মান ও মর্যাদার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে সামাজিক মর্যাদা অর্জিত, আরোপিত নয়। ব্যক্তি তার কার্যক্রম ও দক্ষতার মাধ্যমে সামাজিক ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে এবং স্বীয় মর্যাদা ধরে রাখতে পারে।

শ্রেণিব্যবস্থা কমবেশি সব সমাজেই বিদ্যমান। এটি মোটামুটি সার্বজনীন একটি ব্যবস্থা। এটি অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। কার্ল মার্কসের মতে, প্রাচীনকাল হতে আজ অবধি যত সমাজব্যবস্থা রয়েছে সকল সমাজের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার উপস্থিতি খুব কমই দেখা যায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ

সামাজিক শ্রেণিব্যবস্থা ও পদমর্যাদা

শ্রেণিব্যবস্থায় একেক শ্রেণির মানুষের অনুভূতি একেক ধরনের হয়ে থাকে। নিম্নশ্রেণির মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে একটু ছোট ভাবে। তারা নিজেদেরকে নিগৃহীত ও অবহেলিত মনে করে। তারা নিজেদের জীবনকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। তারা নিজেদেরকে সমাজের শীর্ষ পর্যায়ের লোক মনে করে। তাছাড়া শ্রেণিব্যবস্থায় আরও কিছু উপলব্ধি পরিলক্ষিত হয়। যেমন একই শ্রেণির সদস্যরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে সমান সম্পর্ক অনুভব করে। সমাজে যারা অন্যদের তুলনায় নিম্ন অবস্থানে রয়েছে, তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে।

শ্রেণিব্যবস্থায় শ্রেণি সামাজিক মর্যাদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তাই মর্যাদার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। শ্রেণিব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক মর্যাদা অর্থসম্পত্তির পাশাপাশি পেশার ওপরও নির্ভরশীল। সামাজিক মর্যাদা মানুষকে মানসিকভাবে আলাদা করে রাখে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৪ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

সামাজিক স্তরবিন্যাসের দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে মূলত মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হতে। মার্কস মানবসমাজের ইতিহাসকে দেখেছেন শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাসরূপে। যার শেষ পরিণতি শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি। কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এ পর্যন্ত যতগুলো সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে সেগুলো আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রেণি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়েছেন। আদিম সাম্যবাদী সমাজ, প্রাচীন সমাজ, সামন্তবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল, যা সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছে। উৎপাদনের হাতিয়ার বলতে মার্কস শ্রম, ভূমি, পুঁজি-এ তিনটি জিনিসকে বুঝিয়েছেন। এ উপকরণগুলোর ওপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণি ও স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয়। মার্কসের মতে, উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার ওপর ভিত্তি করে সমাজে পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণি বিদ্যমান।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী উৎপাদন পদ্ধতির ওপর শ্রেণিব্যবস্থা নির্ভরশীল। উৎপাদন পদ্ধতি আবার সমাজের বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। শ্রেণিসংগ্রাম কীভাবে সমাজ ও রাজনীতিতে পরিবর্তন আনে তা মার্কস আলোচনা করেছেন। বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ এবং পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, পুঁজিবাদী সমাজে সর্বহারা শ্রেণির উত্থান ও তাদের সংগঠিত হওয়া, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বের কারণ এবং সেই দ্বন্দ্বে শ্রেণিসমূহের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো মার্কস দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন। এ বিষয়গুলো তিনি তার জীবদ্দশায় পুঁজিবাদী সমাজে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস এবং সে স্থলে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মার্কসই প্রথম সর্বহারাদের সচেতন শ্রেণি (Class for itself) ও অসচেতন শ্রেণি (Class in itself) নামক দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে এগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদেরকে নানাভাবে শোষণ করা হতো। পুঁজিপতিরা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে থাকে। কিন্তু তারা শ্রমিকদেরকে মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করত। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদেরকে ন্যূনতম মজুরি প্রদান করত যাতে তারা কোনো রকমে কাজ করার শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। শ্রম ছাড়া শ্রমিকদের বিক্রির আর কিছুই নেই।

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

পারে না। ফলে পুঁজিপতিগণ নির্ধারিত মূল্যে শ্রমিকদের নিকট থেকে শ্রম আদায় করতে পারে এবং ইচ্ছামতো তাদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রম অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে এবং শ্রমিকগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য পুঁজিপতিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে পুঁজিপতিরা পরাজিত হয়। ফলে শ্রমিকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণহীন এক সাম্যব্যবস্থা। মার্কস বলেন, "When under capitalism all wealth was concentrated into the hands of only a few individuals, it was easy for the workers to revolt and dispose of those few capitalist and there by set up the dictatorship of the proletariat." (যখন সমস্ত সম্পদ অল্প কিছু পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হলো তখন বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং সেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদেরকে উৎখাত করা শ্রমিকদের জন্য সহজ হয়ে গেল এবং শ্রমিকদের রাজত্ব কায়েম হলো।) মার্কসের মতে, পুঁজিবাদই পুঁজিবাদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

কারণ বেশি উৎপাদন ও একচেটিয়া বাজার দখল পুঁজিবাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এ প্রবণতার কারণে সমস্ত সম্পদ অল্প কিছু পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। ফলে পুঁজিপতিদের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পুঁজিপতিদের আরেকটি প্রবণতা হচ্ছে শিল্পের কেন্দ্রীভূতকরণ। কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় শিল্পের কেন্দ্রীকরণের ফলে সেই এলাকায় শ্রমিকদের সংগঠিত করা সহজ হয়। সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পুঁজিপতিদের সমপর্যায়ে পৌছে। অন্যদিকে, শ্রমিকগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

পুঁজিবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুঁজিপতিরা বিশ্ববাজার দাবি করে। ফলে বিশ্বের শ্রমিকরা একাত্মতা অনুভব করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পুঁজিপতিগণ শোষণ করতে করতে এমন চরম অবস্থায় পৌঁছবে যখন শ্রমিকদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। তখন তারা বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজবে।

মার্কসের মতে, পুঁজিপতিরা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। শোষণের মাত্রা যখন চরম পর্যায়ে পৌছে তখন শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ছকের মাধ্যমে মার্কস বর্ণিত উৎপাদন ব্যবস্থা দেখানো হলো-

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

মার্কসের ন্যায় সাম্প্রতিককালের মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকগণও বিশ্বাস করেন যে, মানুষ সম্পত্তি, মর্যাদা ও ক্ষমতার জন্য সবসময় দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তবে মার্কসবাদী আধুনিক তাত্ত্বিকগণ শ্রেণিদ্বন্দ্বের বাইরেও চিন্তা করেছেন। তাদের মতে এ দ্বন্দ্ব লিঙ্গ, গোষ্ঠী, বয়স বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এ তত্ত্বের অন্যতম প্রভাবশালী একজন তাত্ত্বিক ব্রিটিশ দার্শনিক Ralf Dahrendorf মার্কসের ব্যাখ্যাকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের উপযোগী করে প্রয়োগ করেন। সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কে তিনি বলেন, "Social class are groups of people who share common interest resulting from their authority relationship." অর্থাৎ সামাজিক শ্রেণি হচ্ছে জনসাধারণের সেই গোষ্ঠী যাদের কর্তৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাধারণ স্বার্থ রয়েছে। Ralf Dahrendorf-এর মতে, ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে বুর্জোয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, আইনসভার সদস্য, বিচার বিভাগের সদস্য, আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি প্রমুখ। এ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী সমাজকে নিজেদের সুবিধামতো পরিচালিত করতে চায় যেন সমাজে সবসময় নিজেদের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। যারা সমাজে সম্পদ, মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী তারাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সমাজের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্ষমতাশালীরা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

ক্ষমতাশালীরা সমাজের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করে তাদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায় এবং বিদ্রোহের ঝুঁকি কমায়। ন্যূনতম মজুরি আইন পাস, ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন পাস, সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন পাস, বেকার ভাতা প্রদান, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সংস্কারমূলক কাজের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সমালোচনা: প্রতিটি তত্ত্বেরই আলোচনার পাশাপাশি সমালোচনা রয়েছে, তেমনি মার্কসের তত্ত্বও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। মার্কসের শ্রেণিতত্ত্বের অন্যতম সমালোচনা হলো ধনতান্ত্রিক সমাজে কীভাবে সর্বহারাদের বিপ্লব কার্যকর হবে তা স্পষ্ট নয়। কার্ল মার্কস বলেছেন, বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু পুঁজিবাদ না এসেও রাশিয়া এবং চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

মার্কস শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে সমাজের স্তরবিন্যাসের সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি শুধু ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি সম্পর্কিত আলোচনার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। শ্রেণিতত্ত্ব সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ মনে করা হয়।

মার্কস পুঁজির মালিককে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং ভূমির মালিককে ভূস্বামী বলেছেন। কিন্তু ভূমিও এক অর্থে পুঁজি। যার ফলে মার্কসের এ শ্রেণিবিভাগও সমালোচিত হয়েছে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকগণ সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু কার্যগত পূর্বশর্ত পালনের কথা বলেছেন। এ শর্তগুলো পূরণের ওপর নির্ভর করে সামাজিক স্তরবিন্যাস। সমাজ যেহেতু বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত, সেহেতু সমাজকে তার স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিয়মনীতি, প্রথা, মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা, সমাজের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা বজায় থাকে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকগণের মধ্যে Kingsley Davis ও Wilbert Moore উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের 'Some Principles of Stratification' নামক গ্রন্থে বলেন, "Society must distribute its members among a variety of social positions. It must not only make sure that these positions are filled but also see that they are staffed by people with the appropriate talents and abilities. Rewards, including money and prestige are based on the importance of a positions and relative scarecity of qualified personnel." তাদের মতে, সমাজের কার্যকর পরিচালনার জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তার মধ্যে ভূমিকা, বণ্টন ও কর্মদক্ষতা উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

Kingsley Davis & Wilbert Moore সামাজিক স্তরবিন্যাসকে কেবল সার্বজনীনই মনে করেননি, সমাজের কার্যকারিতার জন্যও জরুরি বলে মনে করেন। কারণ সমাজের কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি সম্মান ও পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অধিক মেধাসম্পন্ন লোক ছাড়া করা যায় না। তাছাড়া অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণেরও প্রয়োজন পড়ে। এজন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ছাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণে সাধারণত কেউ রাজি হয় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে যোগ্যতা ও মেধাসম্পন্ন লোক নিয়োগ দিতে হয়। ফলে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতেও তারা অবস্থান নেয়। ডেভিস ও মুরের মতে এ সমস্ত মেধাবী এবং দক্ষ লোকেরা সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থান করে। এজন্য তারা তুলনামূলকভাবে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দাবি করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

ডেভিস ও মুরের মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে একধরনের বাজার ব্যবস্থা। বাজারে যেমন দুষ্প্রাপ্য পণ্যের সরবরাহ কম কিন্তু চাহিদা ও মূল্য বেশি ঠিক তেমনি সমাজের চাহিদা অনুযায়ী মেধাবী এবং দক্ষ লোকের সরবরাহ কম বলে তাদেরকে বেশি পারিশ্রমিক, ক্ষমতা এবং মর্যাদা দিতে হয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে হলে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে স্বীকার করতে হবে। তাদের মতে, সামাজিক অসমতা বা বৈষম্যগুলো সমাজে অনেকটা অচেতনভাবে বা অজান্তেই সৃষ্টি হয়। তার কারণ হচ্ছে সমাজে বিভিন্ন স্তরের কাজ রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে মেধা এবং যোগ্যতার পার্থক্য। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ দিতে হয়। তাই আমরা না চাইলেও সমাজে স্তরবিন্যাস সক্রিয়ভাবেই সৃষ্টি হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

সমালোচনা: আলোচনার পাশাপাশি সব বিষয়েরই সমালোচনা থাকে। ঠিক তেমনি কিংসলে ডেভিস ও উইলবার্ট মূর-এর ক্রিয়াবাদী মতবাদও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মেধাবী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের আকর্ষণের জন্য স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। Bottomore-এর মতে, ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটিকে যে সর্বজনীন ও সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা হয়েছে তা অসত্য। তিনি আরও বলেন, ক্রিয়াবাদী ওই তত্ত্ব সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায় বিশ্লেষণ করে না।

ডেভিস ও মুর-এর মতে, উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকতে হয় বিধায় সমাজের একটি শ্রেণি বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা ব্যক্তিমালিকানার উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির মালিক হন এবং কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়াই তারা সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন।

পরিশেষে বলা যায়, সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ডেভিস ও মূরের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৫ সামাজিক অসমতার ধারণা

সামাজিক অসমতার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক অসমতার ধারণা

আভিধানিক অর্থে সমতা (Equality) বলতে বোঝায় সমান হওয়া। যেমন বলা যায়, আইনের চোখে সমান অধিকারী হওয়া। অথবা বলা যায়, মহিলারা অদ্যাবধি পুরুষের সমান অধিকার অর্জনে সফল হওয়ার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, আকার-আকৃতি, মাত্রা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমতার অভাবই হচ্ছে অসমতা (Inequality)। বিশেষ করে পদমর্যাদা, সম্পদ, সুযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অশোভন বা অন্যায্য পার্থক্যই হলো অসমতা (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Encyclopedia Edition) ।

সামাজিক অসমতা মানে হচ্ছে সমাজের কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর অসম বণ্টন। সমাজ তার দুর্লভ, কাঙ্ক্ষিত ও মূল্যবান বিষয়বস্তু বা সম্পদ বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে অসমভাবে বণ্টন করে। সামাজিক অসমতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক অসমতাও পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক অসমতা বলতে বোঝায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য বা অসাম্যের অস্তিত্ব। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মর্যাদা ও সম্পদের পরিমাণ শ্রেণি, বর্ণ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক অসমতা সমাজের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে বিভক্তি বা শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টি করে। সমাজের দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে মর্যাদা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, দান-অনুদান, বিধিনিষেধ বা অন্যান্য পার্থিব সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখা যায় তাকেই সামাজিক অসমতা বলে। সামাজিক অসমতার তেমন কোনো সুস্পষ্ট ও সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন দার্শনিক সামাজিক অসমতা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন।

সামাজিক অসমতার ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী নেইল জে. স্মেলসার তার 'Sociology' নামক গ্রন্থে সামাজিক অসমতা সম্পর্কে বলেন, Inequality refers to the condition in which people don't have equal access to social rewards, such as, money, power and prestige. অর্থাৎ অসমতা এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে মানুষ সামাজিক বিষয়াদি যেমন- অর্থ, ক্ষমতা ও সম্মানের ক্ষেত্রে সমান অধিকার পায় না।

Encyclopedia of Sociology -তে এলমার (Elmer) বলেন, "সামাজিক অসমতা হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে সমাজের সদস্যবৃন্দ অসম পরিমাণ সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতার অধিকারী হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী J. Matras সামাজিক অসমতার সংজ্ঞায় বলেন, "সামাজিক অসমতা হচ্ছে সামাজিক পুরস্কার, সম্পদ এবং সুবিধা, সম্মান ও শ্রদ্ধা, অধিকার ও পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা ও প্রভাবের অসম বণ্টন যা সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের ভিত্তিতে সুসংগঠিত হয়।"

সামাজিক অসমতার ধারণা

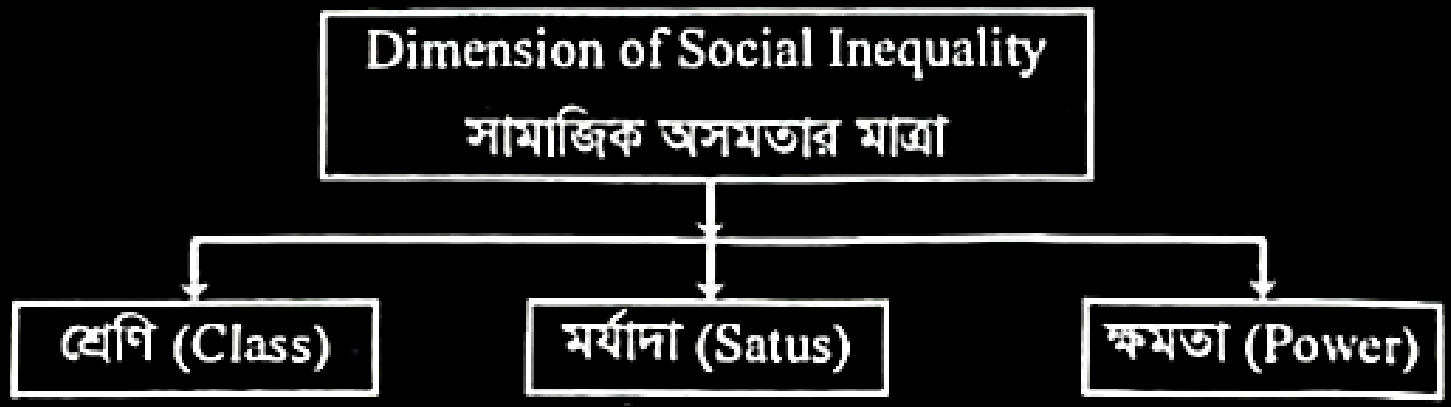

সামাজিক অসমতার ধারণা

বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্কস তার The Capital (Vols. I, II, III-NY 1967 P-7)-এ বলেন, "The Basic causes of Social inequality is the ownership of private property in society." অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপস্থিতির কারণেই সমাজে অসমতা তৈরি হয়।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তার 'সামাজিক অসমতা তত্ত্ব ও গবেষণা' গ্রন্থে বলেন, সামাজিক অসমতা বলতে আমরা কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুতে অসম অধিকারকে বুঝি। কেবল তা-ই নয়, যেহেতু সমাজই তার দুর্লভ মূল্যবান তথা কাঙ্ক্ষিত বা সম্পদগুলোকে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মাঝে অসমভাবে বণ্টন করে তাই-ই সামাজিক অসমতা।

B. Bhushan তার 'Dictionary of Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "কোনো দল বা সমাজের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান বা পদমর্যাদার জন্য বিদ্যমান অসম সুযোগ-সুবিধা এবং পুরস্কার হচ্ছে সামাজিক অসমতা।"

সামাজিক অসমতার সংজ্ঞায় H. R. Kerbo বলেন, "সামাজিক অসমতা হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যার দ্বারা সমাজের মূল্যবান সম্পদ, পেশা এবং অবস্থানের ওপর জনগণের অসম অধিকার সৃষ্টি হয়।"

সামাজিক অসমতার ধারণা

বিংশ শতকের শুরুতে ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সমাজের অসমতার তিনটি প্রধান উপাদান চিহ্নিত করেছেন।

সামাজিক অসমতার ধারণা

(ক) সম্পদের অসমতা (Inequality of Wealth),
(খ) মর্যাদার অসমতা (Inequality of Prestige) ও
(গ) ক্ষমতার অসমতা (Inequality of Power).

প্রথম উপাদানের সাথে যুক্ত রয়েছে সম্পত্তি অথবা বেতন, যার ভিত্তিতে Max Weber পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজের শ্রেণি কাঠামো বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়টির সাথে জীবনযাত্রার মান জড়িত, যার ভিত্তিতে মর্যাদা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। আর তৃতীয়টির সাথে যুক্ত রয়েছে রাজনীতি এবং একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল। এভাবেই Max Weber শ্রেণি, মর্যাদা এবং গোষ্ঠী অসমতার তিনটি প্রধান ধরন বা উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে তা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৬ সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

সামাজিক অসমতা সমাজের একটি অতি প্রাচীন ধারণা। সমাজের সৃষ্টি যখন হয়েছে তখন থেকেই সামাজিক অসমতার ধারণা বিকশিত হতে থাকে। মূলত সমাজই সামাজিক অসমতা সৃষ্টি করেছে। সামাজিক অসমতাকে নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক অনেক গবেষণা-পর্যালোচনা করেছেন। প্রত্যেকেই সামাজিক অসমতার উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মনে করেন, দাসপ্রথা প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মেরই ফলশ্রুতি। জন্মগতভাবেই কিছু মানুষ প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারী, যার বলে সে শাসন করার ক্ষমতা পায়। আবার জন্মগতভাবেই কিছু মানুষ দৈহিক বলে বলীয়ান। এজন্য সমাজে এরা দাস হিসেবে কাজ করে।

অ্যারিস্টটল সামাজিক অসমতাকে স্বাভাবিক, বাস্তবভিত্তিক ও নৈতিক বলে সমর্থন করেছেন। তার মতে, মানুষের মধ্যে সবাই স্বাভাবিক গুণাবলির দিক থেকে সমান নয়। কেউ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অধিকারী আবার কেউ দৈহিক বলে বলীয়ান। আত্মার নিকট দেহ, বুদ্ধির নিকট ক্ষুধা, মানুষের নিকট পশু, পুরুষের নিকট নারী, পিতামাতার নিকট সন্তান যেমন অধীন, ঠিক তেমনি প্রজ্ঞাবান মানুষের নিকট প্রজ্ঞাহীন মানুষ অধীন।

অ্যারিস্টটল সামাজিক অসমতাকে শুধু প্রকৃতির স্বাভাবিক ও শাশ্বত বিধান হিসেবেই নয় বরং এটিকে ন্যায়সংগত, স্বতঃসিদ্ধ, যথার্থ, বাস্তব, ন্যায্য ও নিরপেক্ষ বলে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

ফরাসি দার্শনিক রুশো মনে করেন, মানবসমাজে যখন লোহা ও কৃষির আবিষ্কার ঘটে এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই সামাজিক অসমতার ধারণা বিকশিত হতে থাকে। অর্থাৎ মানুষের মাঝে যখন প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং লোক ঠকানোর প্রবণতা দেখা দেয়, তখনই সামাজিক অসমতার গোড়াপত্তন হয়। রুশো তার 'Discourse on the origin of inequality' নামক গ্রন্থে দৈহিক অসমতা ও রাজনৈতিক অসমতা নামে দুই ধরনের অসমতার কথা বলেন। তার মতে, দৈহিক অসমতা বয়স, স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি, আত্মা ও মনের গুণাবলির পার্থক্যের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এটি স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক অসমতাকে তিনি তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়ে তাৎপর্যহীন বলে উল্লেখ করেন। রুশো রাজনৈতিক অসমতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে, রাজনৈতিক অসমতার কারণে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেগুলোই সমাজ গঠনের সাথে সম্পৃক্ত। রুশো সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা ইত্যাদির মধ্যেই সামাজিক অসমতার মৌলিক বিষয়গুলো নিহিত বলে মত দিয়েছেন।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

এমিল ডুর্খেইম তার 'The Division of Labour in Society' নামক গ্রন্থে সামাজিক অসমতা সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেক সমাজেই কিছু কাজকে অন্যান্য কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তাছাড়া মেধার ক্ষেত্রেও সমাজের মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ডুর্খেইম সমাজের অস্তিত্বের জন্যই সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো মেধাবী, দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের দিয়ে করানো উচিত বলে মনে করেন। ফলে কাজের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে পদ, দায়িত্ব, মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতার সৃষ্টি হয়।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

Adam Ferguson তার 'History of Civil Society' নামক গ্রন্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবকে প্রকৃতির রাজ্যের সাম্যভিত্তিক সমাজের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। জন মিলারও (John Miller) ফার্গুসনের ন্যায় একই ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে মানুষ যেমন একদিকে অগাধ সম্পত্তির মালিক হতে চায় এবং নিজেকে বিত্তবান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তেমনি সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্যও জোর প্রচেষ্টা চালায়। ফলে প্রকৃতির রাজ্যের সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ক্রমেই বিলুপ্ত হতে থাকে এবং সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

সমাজবিজ্ঞানী ডাহরেনডর্ফ (Ralf Dahrendorf) তার 'On the Origin of Inequality Among Men' নামক গ্রন্থে সামাজিক অসমতা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি সামাজিক অসমতা সৃষ্টির পিছনে সম্পত্তির বা উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানাকে দায়ী করেননি। সামাজিক অসমতাকে তিনি কর্তৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তার মতে,
সম্পদের বা উৎপাদনের উপকরণগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই কাউকে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেয়। তিনি মনে করেন, সমাজে কর্তৃত্বের অসম বিন্যাস বিদ্যমান। সমাজ এবং সামাজিক অসমতা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেননা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যেমন ভালো আচরণের জন্য পুরস্কার আর মন্দ আচরণের জন্য শাস্তি প্রদান করে। ডাহরেনডর্ফের মতে, সামাজিক অসমতা পুরস্কার ও শাস্তি বণ্টনের সীমাবদ্ধতা ও ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজে যারা পুরস্কার পাওয়ার উপযোগী কাজ করতে পারবে আর যারা পারবে না স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে একধরনের অসমতা সৃষ্টি হবে। ডাহরেনডর্ফের মতে, এটিই সামাজিক অসমতা যা সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভিককালেই পুরস্কার ও শাস্তির নিরিখে বিকশিত হয়ে আজও অব্যাহত আছে।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

কতিপয় দার্শনিক যেমন স্টেইন, মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ সামাজিক অসমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার পরে শ্রমবিভাজনকে দায়ী করেন। Engels শ্রমবিভাজনের ওপর ১৮৭০ সালে এক তত্ত্ব দাঁড় করান। তার এ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অনেক দার্শনিক শ্রমবিভাজনকে শ্রেণিবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অভিহিত করেন।

কেউই সামাজিক অসমতাকে যৌক্তিক মনে করেন না। সবাই সাম্যভিত্তিক সমাজের আশা করেন। অতীতেও সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের অনেক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। অনেক আন্দোলন, বিপ্লব হয়েছে, সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি বিশ্বের কোথাও পরিপূর্ণ সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সব সমাজেই কমবেশি অসমতা বিদ্যমান।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৭ সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

সামাজিক অসমতার বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে অসমতা দুই ধরনের। যথা-

১. জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতা ও

২. সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতা।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

সামাজিক অসমতার জৈবিক উপাদানগুলো মূলত প্রাকৃতিক। এগুলোর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। তবে উপাদানগুলো জৈবিক হলেও এগুলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব মূলত সামাজিক। কেননা সমাজবদ্ধ মানুষই এ জৈবিক উপাদানগুলোকে মূল্যায়ন করে। সমাজই বংশ, বয়স, লিঙ্গ, বর্ণ ইত্যাদি ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য করে থাকে। জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতাগুলো ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

নিচে জৈবিক উপাদানভিত্তিক সামাজিক অসমতাগুলো আলোচনা করা হলো-

১. লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অসমতা: প্রকৃতিগতভাবে মানুষ নারী ও পুরুষ এ দুই ভাগে বিভক্ত। নারী ও পুরুষভেদে যে সামাজিক অসমতা তা মনুষ্য সৃষ্ট নয়। এ অসমতা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই মহিলারা গর্ভধারণ করে, সন্তানদের দুগ্ধ পান করায় ও লালন-পালন করে। এগুলো নারীদের প্রধান কাজ বলে তারা গৃহে অবস্থান করে। দৈহিক ও শারীরিক দিক থেকে তারা দুর্বল বলে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল থাকে। পুরুষেরা দৈহিক ও শারীরিক দিক থেকে নারীদের তুলনায় বৃহদাকৃতির ও বলীয়ান হয়ে থাকে। এজন্য তারা নারীদের ওপর সবসময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বমূলক আচরণ করে। প্রকৃতিই নারীদেরকে পুরুষের অধীন করে সৃষ্টি করেছে।

২. বয়সভিত্তিক সামাজিক অসমতা: বয়সভেদেও সামাজিক অসমতা সৃষ্টি হয়। এ অসমতাও জৈবিক উপাদানভিত্তিক। কেননা জৈবিক কারণেই শিশুরা বড়দের ওপর নির্ভরশীল হয়। কারণ তারা বড়দের মতো শারীরিক পরিশ্রম করতে পারে না। আবার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও যুবকদের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। এজন্য তারাও পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাছাড়া বয়সের তারতম্যের কারণে সম্মান ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য ঘটে থাকে।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

৩. বুদ্ধিভিত্তিক সামাজিক অসমতা: বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, ধীশক্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়। এগুলোও প্রকৃতির দান। বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, ধীশক্তি ইত্যাদির মাত্রা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে সামাজিক অসমতা দেখা দেয়। সাধারণত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা অশিক্ষিত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়ের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হয়। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিনের মতে, নিম্নশ্রেণির মানুষের সন্তানের চেয়ে উচ্চশ্রেণির মানুষের সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন এক বুদ্ধিমত্তা জরিপে দেখা গেছে, বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে কিছু শ্বেতকায় ব্যক্তির চেয়ে কিছু কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বেশি পয়েন্ট অর্জন করে। কিন্তু ব্যতিক্রম প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে ভঙ্গ করতে পারে না।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

৪. বংশভিত্তিক সামাজিক অসমতা: বংশগত দিক থেকেও মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয়। সমাজতন্ত্রের কোনো বিশেষ বংশের লোকজন যদি অন্যান্য বংশের লোকজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয় তাহলে উক্ত বংশের লোকজন অন্যান্য বংশের লোকজন অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশি সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং সামাজিক মর্যাদাও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। যেমন- রাজপরিবার অন্যান্য সাধারণ পরিবারের তুলনায় বেশি সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। বংশ মর্যাদাভেদে সামাজিক অসমতা আদিম সমাজেও ছিল। দাসনির্ভর সমাজব্যবস্থায় সমাজ মনিব, সাধারণ মানুষ ও দাস-এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। গ্রিক সমাজে দাসরা ছিল যুদ্ধবন্দি ও ক্রীতদাস। তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হতো না। দাসদের মনিবের সম্পত্তি বলে মনে করা হতো। মনিবেরা দাসদেরকে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। বর্তমানেও বংশের উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা অনুযায়ী মানুষের মর্যাদার পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

জৈবিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

৫. বর্ণভিত্তিক সামাজিক অসমতা: সামাজিক অসমতার ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই একেকজন একেক বর্ণে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করে আজীবন সে বর্ণের পরিচয় বহন করে। ইচ্ছা করলেও সে তার বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। হিন্দুধর্মে বর্ণপ্রথা মেনে চলা হয়। বর্ণের ভিত্তিতে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। হিন্দুধর্মে চারটি জাতিবর্ণ রয়েছে। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। হিন্দুশাস্ত্রে অস্পৃশ্য নামে আরেকটি বর্ণের কথা বলা হয়। এদেরকে অস্পৃশ্য বলা হয়। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিম্নবর্ণের লোকেরাও অনেক সম্মানজনক চাকরি করছে। তারপরও বর্ণভিত্তিক সামাজিক অসমতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

৬. নরগোষ্ঠীভিত্তিক সামাজিক অসমতা: নরগোষ্ঠীগত সামাজিক অসমতার অস্তিত্ব বিশ্বে খুব একটা নেই বলেই অনেকে দাবি করেন। বিভিন্ন তাত্ত্বিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নরগোষ্ঠীগত সামাজিক অসমতাকে প্রত্যাখ্যান করেন। আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতো গণতান্ত্রিক দেশেও নরগোষ্ঠীগত সামাজিক অসমতা বিদ্যমান রয়েছে। বস্তুত শ্বেতকায় বনাম কৃষ্ণকায় দ্বন্দ্ব বর্তমানে ভয়াবহ রূপধারণ করেছে। শ্বেতকায় বনাম মঙ্গোলীয় সমস্যাও বর্তমানে অনেক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি করেছে।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতাগুলো মূলত মানবসৃষ্ট। সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতাগুলো মানুষ ইচ্ছাকৃত বা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করে। যুগ যুগ ধরে সমাজে বাস করতে গিয়ে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে লোকচক্ষুর অন্তরালে সৃষ্টি হয়েছে অনেক অসমতা বা বৈষম্য। এ বৈষম্যগুলো মূলত সমাজব্যবস্থারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যা হলো- ১. শ্রেণি অসমতা, ২. ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতা, ৩. সামাজিক মর্যাদা ও ভূমিকার ক্ষেত্রে অসমতা ইত্যাদি।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

নিচে সামাজিক উপাদানভিত্তিক এ অসমতাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. শ্রেণি অসমতা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির লোক বাস করে। যেমন- উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত, বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণি ইত্যাদি। আবার পেশাগত দিক দিয়েও সমাজে শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টি হয়। বিখ্যাত জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস এ শ্রেণিভিত্তিক অসমতার কথা স্বীকার করেছেন। তার মতে, পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি উৎপাদন যন্ত্রের মালিক। অন্যদিকে, শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিপতিদের কারখানায় তাদের শ্রম বিক্রি করে। উৎপাদনের উপকরণের ওপর তাদের কোনো মালিকানা নেই। মার্কস মনে করেন, আজ পর্যন্ত যত সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সকল সমাজের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শ্রেণিবৈষম্যের কথা অস্বীকার করা যায় না। উৎপাদন যন্ত্রে মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে শোষণের মাত্রা হ্রাস পেলেও শ্রেণিভিত্তিক ক্ষমতার অসম বণ্টন এখনও রয়ে গেছে।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

২. ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসমতা: সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট আরেকটি সামাজিক অসমতা হচ্ছে ক্ষমতাভেদে সামাজিক অসমতা। সব সমাজেই নেতা ও অনুগামী থাকে। এদের মধ্যে সমতাবিধান করা সম্ভব নয়। নেতা সবসময়ই ক্ষমতার অধিকারী হবে, অনুগামীদের আদেশ-উপদেশ দিবে আর অনুগামীরা তা মেনে চলবে। এটি খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। ফলে অনুগামী কখনো নেতার সমপর্যায়ে আসতে পারবে না। সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন রয়েছে এবং প্রতিটি সংগঠনেই নেতৃত্বের প্রশ্ন রয়েছে। সংগঠনে বা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার কাঠামোয় সবার স্থান এক নয়।

সামাজিক অসমতার প্রকারভেদ

সামাজিক উপাদানভিত্তিক অসমতা

৩. সামাজিক মর্যাদা ও ভূমিকার ক্ষেত্রে অসমতা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের দাতব্য সংস্থা বা জনকল্যাণমূলক সংগঠনও থাকতে পারে। অনেক সময় সবাই এসব সংস্থা বা সংগঠনের সদস্য হতে পারে না। কিছু কিছু সংগঠন বা সংস্থা আছে যেগুলো বিশেষ মর্যাদা বা ক্ষমতার অধিকারী। সংগঠনে কাজ করতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় ঘটে। এতে মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন আসে।

সমাজে কিছুসংখ্যক মানুষ আছে যারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। যেমন- আর্তমানবতার সেবায় আজকাল অনেকেই এগিয়ে আসছে। সামাজিক অনাচার-অবিচার রোধে কিছু কিছু মানুষ তৎপর ভূমিকা রাখে। শুধু ধনী বা মধ্যবিত্ত লোকই নয়, সমাজের অনেক নিম্নবিত্ত লোকও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কেউ কেউ সরকারি উদ্যোগে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার কেউ বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংস্পর্শে এসে নিজেকে মানবতার সেবায় নিয়োজিত করে। এ ধরনের মানুষ সমাজে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। তাছাড়া সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও এরা অগ্রাধিকার পায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৮ জেন্ডার ধারণা

জেন্ডার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জেন্ডার ধারণা

জেন্ডার শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে লিঙ্গ। সাধারণত ব্যাকরণে 'লিঙ্গ' চিহ্নিত করার জন্য জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীব লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে জেন্ডার শব্দটি দ্বারা সেক্স বা লিঙ্গ বোঝালেও সাম্প্রতিককালে শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন Ann Oakley (১৯৭০ সালে)। জেন্ডার শব্দটি মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলেও বর্তমানে আধুনিক নারীবাদীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এটি ব্যবহার করছেন। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী বা পুরুষ হিসেবে আমাদের সামাজিক পরিচয় যে ভিন্ন সেটি বোঝানোর জন্যই জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের সৃষ্ট প্রভেদ। এ প্রভেদ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষের কাজকর্মের ক্ষেত্রে মানুষের জৈবিক কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। নারী ঘর-গৃহস্থালির কাজ করবে আর পুরুষেরা অফিস-আদালতে চাকরি করবে। প্রাকৃতিকভাবে এ ধরনের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। এ সীমাবদ্ধতা বা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সমাজ। অর্থাৎ সন্তানধারণ হচ্ছে নারীর সেক্স ভূমিকা আর রান্নাবান্না করা, সন্তান লালন-পালন করা এগুলো হচ্ছে নারীর জেন্ডার ভূমিকা।

প্রখ্যাত নারী প্রবক্তা কমলা ভাসিন-এর মতে, সেক্স মানুষকে জৈবিকভাবে ছেলে ও মেয়ে হিসেবে তৈরি করে। কিন্তু জেন্ডার তাকে পুরুষ ও নারীতে পরিণত করে। জেন্ডার শব্দটি নারী ও পুরুষের ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে শুরু করে মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

জেন্ডার ধারণা

W. Scott-এর মতে, জেন্ডার হলো নারী-পুরুষের মধ্যে অনুভূত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক সম্পর্কের উপাদান।

Oxford English Dictionary অনুযায়ী, "Gender can be defined as the sex of characteristics, roles and responsibility, that distinguish women from men which are not constructed bilogically, but defiend socially and culturally."

সুসান বাকিংহাম হাটফিল্ড (Susan Buckingham Hatfield) তার 'Gender' গ্রন্থে বলেন, It is a social construction organized biological sex. Individuals are born male or female, but they acquire over time a gender identity, that is what is means to be male or female.

অতএব বলা যায়, জেন্ডার নারী ও পুরুষের ওপর আরোপিত সামাজিক পরিচয় বহন করে। এটি নারী-পুরুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সমাজের সর্বস্তরে উভয়কে সমভাবে প্রভাবিত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ০৯ নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

নারী-পুরুষের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ, যা জেন্ডার সম্পর্কিত মতবাদ নামে পরিচিত। নারী ও জেন্ডার সম্পর্কিত গবেষণা বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জেন্ডার বিষয়টি দ্বারা সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। নারী-পুরুষের অবস্থানগত সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনা করে বলা যায়, পুরুষেরা নারী অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগামী। তাই বর্তমান চলমান বিশ্বে জেন্ডার উন্নয়ন বলতে নারী উন্নয়ন এবং নারীকেই অগ্রাধিকার দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

নারীবাদ সম্পর্কিত ধারণা: নারীবাদ বলতে সাধারণভাবে বলা যায়, একজন মানুষ হিসেবে নারীর পরিপূর্ণ অধিকারের দাবি। নারীবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Feminism'। 'Feminism' শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ 'Femenenisme' থেকে। 'Femne' অর্থ নারী, 'isme' অর্থ মতবাদ। শব্দটি প্রথম ১৮৮০-এর দশকে ফ্রান্সে গৃহীত হয়। এরপর ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করা হয়।

Olive Banks তার Faces of Feminism গ্রন্থে বলেন, যে গোষ্ঠী নারীর অবস্থান কিংবা নারী সম্পর্কে ধ্যানধারণা পরিবর্তনের প্রয়াসী তাদের নারীবাদী বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

নারীবাদী Christina Hoff Sommers-এর মতে, নারীবাদ হচ্ছে "A concern for Women and a determination to see them fairly treated."

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

Rosemarie Putnam Tong তার 'Feminist Thought' গ্রন্থে বলেন, "No doubt Feminist thought will eventually shed these labels for others that better express its intellectual and Political commitments to Women."

বিশিষ্ট নারীবাদী চিন্তাবিদ Kamla Basin ও Nighat Said Khan তাদের 'Workshop on south Asian Women'-এ নারীবাদ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে বলেন, "An awareness of women's oppression and exploitation in society, at work and within the family and conscious action by women and men to change this situation."

মূলত নারীবাদ হলো পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর ওপর শোষণ নিপীড়ন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং এ অবস্থা বদলের লক্ষ্যে নারীর সচেতন প্রয়াস।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ নিচে আলোচনা করা হলো-

মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism): মার্কসীয় নারীবাদের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন লেনিন, অগাস্ট বেবেল, ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্ডার কোলনতাই প্রমুখ। তারা নারী নির্যাতনের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন শ্রেণিবৈষম্যকে। মার্কসীয় নারীবাদে নারী সমাজের নিপীড়নের ব্যাখ্যা অপ্রতুল। শ্রমিক শ্রেণির ওপর বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণ-নিপীড়নকে মার্কসবাদে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার ফলে নারীর ওপর পুরুষের নির্যাতনের ভয়াবহতা অপ্রকাশিত। সভ্যতার ঊষালগ্নে নারীদের এ অধস্তন অবস্থানটি ছিল না। বরং সমাজে নেতৃত্বস্থানে ছিল তখন নারী। সে যুগে পুরুষরা খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার করবে আর নারীরা পরিবারের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করবে। যেহেতু এটি অনিশ্চিত, তাই ফলমূল সংগ্রহ এবং সন্তান লালনের দায়িত্ব নেয় নারী। যাতে সমাজ ও পরিবারের ওপর আসনটি দখল করে নিতে পারে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মার্কসবাদী মতাদর্শ এ নারীবাদের ভিত্তি। মার্কসবাদীরা মনে করেন, Capitalism উচ্ছেদ করে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নারীমুক্তি সম্ভব হবে। মূলত নারী মুক্তি এবং নারী-পুরুষ সমতার জন্য সমাজের একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়োজন। একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই পারে সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। এ বিপ্লবের মাধ্যমেই নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমতা আনবে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায়। এ প্রক্রিয়ায় পরিবার ব্যবস্থা আরও দৃঢ় হবে।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

উত্তর-আধুনিকতাবাদী নারীবাদ (Post Modern Feminism): সাধারণত জেন্ডার বলতে নারী-পুরুষের যে সম্পর্ককে অভিহিত করা হয় তা এক ধরনের সমাজ সৃষ্ট ক্ষমতার খেলা, যা নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের দ্বারা বিভক্ত। উত্তর আধুনিকতাবাদে বলা হয় কোনো কিছুই ধ্রুব নয় এবং চিরন্তনও নয়। অর্থাৎ নারীবাদীদের মতে, সমাজ সৃষ্ট নারী-পুরুষের যে সম্পর্ককে এবং সামাজিক ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে দেয় তা পরিবর্তন করতে হবে।

উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism) : উদারনৈতিক নারীবাদের বৈশিষ্ট্য হলো বর্তমান সমাজ কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে পুরুষের মতো নারীও সমান অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। Marey Wollstone Carft, John Stuart Mill, Harriet Taylor উদারনৈতিক নারীবাদের প্রবক্তা। এরা মূলত সংস্কারে বিশ্বাসী। তাদের মতে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য ও অসমতা দূর করা সম্ভব তখনই যখন বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইনকানুন, বিধিব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করা সম্ভব হবে।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

চরমপন্থি নারীবাদ বা আমূল নারীবাদ (Radical Feminism): সাম্প্রতিক বিশ্বের বিশ শতকের সত্তর দশক থেকে চরমপন্থি নারীবাদের ধারণা পাওয়া যায়। শুলামিথ ফায়ারস্টোন (Shulamith Fireston) তার নারীবাদী এক গ্রন্থে চরমপন্থি নারীবাদের কথা বলেছেন। তার মতে, পুঁজিবাদকে নারী বৈষম্য-বঞ্চনার উৎস হিসেবে স্বীকার করা হয়। বরং সেখানে বলা হয় নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রকৃতিগত। মূলত নারী অধস্তন কেননা প্রকৃতি নারীকে সন্তান ধারণের ক্ষমতা দিয়েছে। সন্তান ধারণের এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই নারী দুর্বল। আর তাই পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট অধস্তন। তিনি আরও বলেন, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন না হবে, ততদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষের বৈষম্য থাকবেই।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism): নারীবাদকে অনেকে Social Feminism রূপেও অভিহিত করেন। Radical Add Marxist Feminism সম্মিলিত রূপ হলো সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। এদের মতে, নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণ হলো ধনতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের জটিল মিথস্ক্রিয়া। নারী মুক্তি কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন বিলোপ সাধন হবে ধনতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের। মূলত নারীর প্রকৃত স্বাধীনতাই সমাজে সমতা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে।

কৃষ্ণ নারীবাদ (Black Feminism) : ভ্যালেরি স্মিথের মতে, এ নারীবাদের আছে নানা মাত্রা। মূলত শ্বেতাঙ্গ নারীবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা এ নারীবাদের জন্ম দিয়েছেন। কৃষ্ণ নারীবাদের আলোচনায় জেন্ডার, যৌনতা ও বর্ণবাদের ব্যাখ্যা দিয়েই শুরু করা হয়। অতএব, পশ্চিমা নারীবাদের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় কৃষ্ণ নারীবাদের প্রভাবকে।

সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism) : সাংস্কৃতিক নারীবাদ মনে করে, জেন্ডার সম্পর্ক সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট এবং তা পরিবর্তনযোগ্য। Radica এবং Socialist Feminism-এর সম্মিলিত রূপ হচ্ছে সাংস্কৃতিক নারীবাদ। মূলত মনস্তাত্ত্বিক গড়নই নারীর অধীনতার কারণ বলে মনে করা হয়, কোনো শারীরিক বৈশিষ্ট্যজনিত পার্থক্যের কারণে নয়।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

পরিবেশ নারীবাদ (Eco Feminism): সর্বপ্রথম ফরাসি নারীবাদী ১৯৭৪ সালে ফ্রাসোয়া দ্য এবোর্নে (Francoise d Eauborne) পরিবেশ নারীবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন, যা অতি সাম্প্রতিক জেন্ডারবিষয়ক আলোচনায় সংযোজন। নারীবাদের দাবি হলো নারী ও প্রকৃতির ওপর সমান্তরালভাবে বিদ্যমান পুরুষ প্রাধান্যের অবসান করা। অর্থাৎ নারী ও প্রকৃতি উভয়ই পিতৃতন্ত্রের নির্মম শিকার।

বৈশ্বিক নারীবাদ (Global Feminism): এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো প্রতিটি সমাজের নারীরা তাদের সমস্যাবলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করে এবং তা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। মূলত লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের কর্মকৌশল এমন একটি সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। বৈশ্বিক নারীবাদ (Feminism)-এর ধারা নারীদের অবস্থানকে বৈশ্বিকভাবে দেখার একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

জেন্ডার সম্পর্কিত উক্ত মতবাদগুলো ছাড়াও কতিপয় আধুনিক মতবাদ রয়েছে সেগুলো হলো-
(ক) জেন্ডার ও উন্নয়ন, (খ) নারী ও উন্নয়ন ও (গ) উন্নয়নে নারী GAD, WAD এবং WID নামে এগুলোকে সংক্ষেপে অভিহিত করা হয়।

(ক) জেন্ডার ও উন্নয়ন (Gender and Development): আশির দশকে জেন্ডার উন্নয়ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এটিকেসমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ধারণা বা তত্ত্বও বলা হয়। যখন নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুণগত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয় তখন এর সমাধানের জন্য GAD-এর উদ্ভব ঘটে। এ তত্ত্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। জেন্ডার ও উন্নয়নের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হলো-

(ক) নারী ও পুরুষ কীভাবে প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করবে।
(খ) কীভাবে তারা প্রকল্পের সম্পদ স্থির করবে।
(গ) কীভাবে সম্পদ পরিচালনা করবে।
(ঘ) কীভাবে এর সুফল ভোগ করবে।

মূলত এ তত্ত্বে শুধু নারীকে নয়, নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হয়। এটি Women শব্দটির পরিবর্তে Gender শব্দটি ব্যবহার করে।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

(খ) নারী ও উন্নয়ন (Women and Development): সত্তর দশকে নারী ও উন্নয়ন ধারণার জন্ম হয়। এটি মূলত নব্য ও
মার্কসবাদী ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। নারী ও উন্নয়ন তত্ত্বে বলা হয়েছে, নারীরা সবসময়ই উৎপাদন প্রক্রিয়ারই অংশ। নারী ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হলো- নারী সমাজের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ নয়, তাদের আলাদাভাবে দেখার কোনো সুযোগও নেই। তাই নতুন করে নারীকে উন্নয়নে সংযুক্ত করার কথা অযৌক্তিক ও অবান্তর।

(গ) উন্নয়নে নারী (Women in Development): প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ইস্টার বোশেরোপ (Ester Boserup) তার Women's Role in Economic Development' গ্রন্থে বলেন, ৬০ ও ৭০ দশকে দেশে দেশে যে উন্নয়ন ঘটেছে, নারীর কাছে তা খুব কমই পৌছেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকাতে পুরুষ ও নারীর কাজের ওপর আধুনিকায়নের কারণে পরিবর্তনের চিহ্নিত ফলাফল পরীক্ষা করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মূলত ইস্টার বোশেরোপের ধারণা এবং উন্নয়ন তত্ত্বের নারী উন্নয়নের নীতিমালার উদ্ভব ঘটায়।

নারীবাদ সংক্রান্ত ধারণা

এগুলো হলো-

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর সম অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা করা।

নারীর জন্য ঋণসেবা প্রদান ও কার্যক্রম প্রসারিত করা।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশু পরিচর্যা কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন করা।

মূলত নারী উন্নয়ন হলো উন্নয়নের এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে নারীর সমস্যাগুলো পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়। ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান সমতা দূর করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না। এ উদ্যোগে নারীর অংশগ্রহণ উন্নয়ন প্রকল্পে বাড়ানো হয় এবং নারীর মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১০ জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে জন্মগতভাবেই নারী ও পুরুষ এ দুটি লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। দৈহিক গঠনের দিক থেকে নারী ও পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই ভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন হরমোনের অধিকারী। এজন্য নারীরা গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান এবং সন্তানদের স্তন্যদানের ক্ষমতা রাখে। আবার পুরুষের সাহায্য ব্যতীত নারীরা সন্তান ধারণ করতে পারে না। একই রক্তমাংসের দ্বারা গঠিত শরীরকে আকৃতির ভিত্তিতে নারী ও পুরুষে আলাদা করা হয়েছে। এ দৈহিক পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। নারীদেরকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের যৌনসঙ্গী হিসেবেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুরুষের সেবাদাসী হওয়া ছাড়াও সমাজের আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যে তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে তা বর্তমান পুরুষশাসিত সমাজ বিশ্বাসই করতে চায় না। বিভিন্নভাবেই নারীদের মেধা ও মননশীলতাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। ফলে সমাজের সর্বস্তরে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এ লিঙ্গবৈষম্যের কারণে নারীরা সমাজের সবক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। যেমন- তারা শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছে, তাদের ক্ষমতায়ন এখনো সেভাবে হচ্ছে না, তাদের কর্মক্ষেত্র বা স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হচ্ছে। এছাড়া লিঙ্গবৈষম্যের কারণে আরও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈষম্য সৃষ্ট হয়, যেগুলো সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অনুন্নয়নের জন্য লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্য দায়ী। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদেরকে বিভিন্নভাবেই পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাদেরকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধে তাদেরকে এখনো অভ্যস্ত করে রাখা হয়েছে।

গ্রামবাংলার সহজ নারীদের আজও বিশ্বাস ঘরকন্যা করা, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন, স্বামীর সেবাযত্ন করা- এগুলোই তাদের প্রধান কাজ। গৃহের বাইরে তাদের কিছু করার নেই। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নেই বলে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি।

লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের কারণে শিক্ষার দিক দিয়েও আমরা সেভাবে এগোতে পারিনি। শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে নারীদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আমাদের সমাজ এখনো মনে করে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ নারীদের জন্য জরুরি নয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাওয়ায় শিক্ষার দিক দিয়ে জাতি হিসেবেই আমরা পিছিয়ে আছি।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের কারণে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজ নারীদের কাজকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে - না। ঘরে নারীরা যে কাজ করে তার কোনো আর্থিক মূল্য নেই। তাছাড়া ঘরের বাইরেও নারীদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় না। নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। এজন্য আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিও ততটা মজবুত নয়।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীরা সমাজের সকল স্তরেই উপেক্ষিত হচ্ছে। তাদের মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অভিমত জানতে চাওয়া হয় না। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিয়ে করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত বা প্রাপ্তবয়স্ক কিনা তাও বিবেচনা করা হয় না।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বমূলক ও প্রভুত্বমূলক আচরণ করে। নারীদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা পুরুষের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। এজন্য নারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষম্যের কারণে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয়। নিজ গৃহ থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরে তারা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। নিজের গৃহে স্বামী বা অন্য কোনো কর্তা ব্যক্তির দ্বারা-শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের প্রভাব

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে নারীর ক্ষমতায়ন আজ অবধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কাজী নজরুলের সেই অমর বাণী-"এ পৃথিবীতে যত সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" এখন পর্যন্ত শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তার মূল্যায়ন বা বাস্তবায়ন আজ অবধি সম্ভব হয়নি। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে নারীদের ক্ষমতায়ন এখন পর্যন্ত সেভাবে সম্ভব হয়নি।

জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীরা সমাজের সবক্ষেত্রেই হেয়প্রতিপন্ন ও উপেক্ষিত হচ্ছে। পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রসহ সবক্ষেত্রেই নারীরা লিঙ্গবৈষম্যের স্বীকার। ফলে আমাদের বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে এখনো পিছিয়ে রয়েছে বলে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১১ বয়সবৈষম্যবাদ ধারণা

বয়সবৈষম্যবাদ ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বয়সবৈষম্যবাদ ধারণা

বয়সবৈষম্যবাদ বা বয়সের ভিত্তিতে সামাজিক অসমতা একটি ঐতিহ্যগত ও চিরন্তন বিষয়। ইতিহাস বিশ্লেষণে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়, প্রত্যেক সমাজ ও সম্প্রদায়ে বয়সভেদে তাদের সদস্যদের মাঝে অসমতা বা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। জৈবিক কারণ এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আর এজন্য বয়সবৈষম্যবাদ একটি আরোপিত বিষয়, অর্জিত নয়। পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই নিম্নলিখিত বয়সভিত্তিক দল দেখা যায়-

১. শৈশবকাল (Infancy),
২. বাল্যকাল (Childhood),
৩. কৈশোরকাল বা বয়ঃসন্ধিকাল (Adolesence),
৪. প্রাপ্তবয়স্ক (Adulhood) ও
৫. বৃদ্ধকাল (Old Age) |

আমরা একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন বিভিন্ন রকমের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখি, তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে বয়সের তারতম্য বিচারে মানুষের প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য লক্ষ করি। কোনো কোনো সমাজে আমরা প্রবীণদের প্রতি খানিকটা নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করি। সেখানে প্রবীণদের একটি আলাদা ধরনের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তথা উপসংস্কৃতি গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা দেখতে পাই। মূলত তাদের প্রতি সমাজের অনেকেই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ ও বিভেদপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে।

বয়সবৈষম্যবাদ ধারণা

১৯৬৮ সালে রবার্ট বাটলা নামক একজন চিকিৎসক বয়োবৃদ্ধ তথা প্রবীণদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বা বৈষম্যমূলক আচরণ বোঝাতে Ageism প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। ব্যাপক অর্থে বয়সের ভিত্তিতে কারও প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক আচরণই হচ্ছে Ageism বা বয়সবৈষম্যবাদের মূলকথা।

Ageism-এর বাংলা পরিভাষা বয়সবৈষম্যবাদ বা বয়স-বিদ্বেষ। ব্যাপক অর্থে বয়সবৈষম্যবাদ বলতে কেবল বয়সের কারণে কোনো বয়স-গোষ্ঠী বা তার কোনো সদস্যের প্রতি নেতিবাচক ধ্যানধারণা বা মনোভাব পোষণ ও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করাকে বোঝায়। তবে জরাবিজ্ঞানে কার্যত বয়সবৈষম্য পদটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর সেটি হলো কেবল বয়সের কারণে প্রবীণদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব (Negative Attitude) পোষণ করা। এর অর্থ প্রবীণ সম্পর্কে বদ্ধমূল বিশ্বাস (Stereotype), বিদ্বেষমূলক মনোভাব এবং পূর্ব সংস্কারমূলক ধ্যানধারণা (Prejudice) পোষণ এবং তদনুযায়ী তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা। বস্তুত প্রবীণ সম্পর্কে বাস্তব ও সঠিক তথ্য না জেনে আগেভাগে বা পূর্বাহ্নে তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধ্যানধারণা তৈরি এবং তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনই হলো Ageism বা বয়স-বিদ্বেষ বা বয়সবৈষম্যবাদ।

বয়সবৈষম্যবাদ ধারণা

বাটলারের মতে, "বয়সবৈষম্যবাদ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বয়সের কারণে প্রবীণের প্রতি বদ্ধমূল বিশ্বাস পোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, যেমনটি করা হয় বর্ণবৈষম্যবাদ (Racism) এবং লিঙ্গবৈষম্যবাদ (Sexism) এর ক্ষেত্রে।" (Ageism can be seen as a process of systematic stereotyping of and discrimination against people because they are old, just as racism and sexism accomplish this with skin colour and gender).

Ageism Age Prejudice-কে একই অর্থে ব্যবহার করে কমফোর্ট (Comfort) বলেন, "বয়সবৈষম্যবাদ হলো বয়োবৃদ্ধি এবং বয়োবৃদ্ধের প্রতি একটি নেতিবাচক মনোভাব ও মেজাজ। বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বার্ধক্যে মানুষ অ-আকর্ষণীয়,

অবুদ্ধিমান, যৌন কর্মে অনাগ্রহী, কাজে নিয়োগের অযোগ্য এবং মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে এমন সব বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি হয় নেতিবাচক ওই মনোভাব ও মেজাজ।" (Age prejudice, or ageism, is a negative attitude or

disposition toward aging and older people based on the belief that aging makes people unattractive, unintelligent, asexual, unemployable and mentally incompetent).

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১২ বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

অবসর গ্রহন তত্ত্ব

অবসর গ্রহণ তত্ত্বের উদ্ভাবক কুমিং এবং হেনরি (Cumming & Henry)। ১৯৬১ সালে তারা এ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ৫০ থেকে ৯০ বছর বয়সের ২৭৫ জন বয়স্ক ব্যক্তি থেকে তারা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা করে এ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। বয়স্ক ওই ব্যক্তিরা সবাই নগর জীবনে অভ্যস্ত এবং আর্থিক দিক থেকে আপেক্ষিক অর্থে সচ্ছল ছিলেন।

অবসর গ্রহণ তত্ত্বে বলা হয়, বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় মানুষ যতই বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলে ততই ক্রমে ক্রমে তার যুব বয়স তথা মধ্যবয়সের সামাজিক কাজকর্ম কমিয়ে দেয় এবং অনেক কাজই ধীরে ধীরে বাদ দিয়ে অবসর নিতে থাকে। পাশাপাশি ওই ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে বা নিজের একান্ত সমস্যাবলি নিয়ে ভাবতে শুরু করে।

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

অবসর গ্রহন তত্ত্ব

এক্ষেত্রে কুমিং এবং হেনরির যুক্তি হলো- যেহেতু বার্ধক্যে পৌছলে মানুষ ক্রমেই মৃত্যু সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে এবং তাদের কর্মশক্তি কমে আসে, সেহেতু তাদের কাজের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে ভাটা পড়তে থাকে। ফলে অবসর গ্রহণ বা Disengagement হচ্ছে বার্ধক্যের একটা স্বাভাবিক পরিণতি। কুমিং ও হেনরি আরও দাবি করেন, অবসর গ্রহণ হচ্ছে সার্বজনীন অবস্থা। অর্থাৎ সব সমাজে সর্বদাই প্রবীণেরা ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ করে। এটিই তাদের ওই বয়সে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কুমিং ও হেনরি আরও বলেন, একদিকে প্রবীণেরা যেমন ধীরে ধীরে হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে তৈরি হয়। অন্যদিকে, সমাজও প্রবীণদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার একটা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে।

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

অবসর গ্রহন তত্ত্ব

অবসর গ্রহণ তত্ত্বে এটাও বলা হয়, মৃত্যু হচ্ছে অনিবার্য। আর এ অনিবার্য সত্যই ব্যক্তিকে তার অধিকাংশ কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। প্রবীণদের পরিত্যক্ত কর্মক্ষেত্রগুলো সমাজের যুববয়সিরা পূরণ করে। প্রবীণদের পরিত্যক্ত সামাজিক ভূমিকায় যুববয়সিরাই অবতীর্ণ হয়। যেহেতু প্রবীণেরা তাদের কাজকর্ম থেকে ক্রমে অবসর গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় এবং এভাবে সমাজ থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে থাকে, এ কারণে এটিকে কেউ কেউ Anticipatory Socialization বা কাঙ্ক্ষিত সামাজিকীকরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় সমাজের কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের বিষয়টি প্রবীণেরা যেন স্বাভাবিকভাব মনে করে এবং তার জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।'

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

সক্রিয়তা তত্ত্ব

সক্রিয়তা তত্ত্বের মূলকথা হলো- জীবন মানেই কর্ম আর কর্মই জীবন। সব বয়সের সব লোকের জন্য সামাজিক কাজকর্ম (Social activity) হচ্ছে মানবজীবনের অস্তিত্বের স্বাক্ষর। এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "Activity theory implies that social activity is the essence of life of all people of all ages" (Barrow Page-55)। প্রবীণদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভালো থাকার জন্য কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকাটা বেশ জরুরি। গবেষণায় দেখা গেছে যেসব মানুষ বেশ কর্মঠ তারাই সমাজজীবনে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিকভাবে বেশি খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। সোস্যাল জারোনটোলোজির একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আর্নেস্ট বার্জেস। তিনি মনে করেন, সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কাজকর্ম থেকে প্রবীণদের বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। '

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

সক্রিয়তা তত্ত্ব

বার্জেস বলেন, প্রবীণদের জন্য উপযোগী নতুন কাজকর্মের ব্যবস্থা করলে তারা সমাজে একটা দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আর এটি তাদের জীবন ও অস্তিত্বকে উৎপাদনশীল রাখতে সক্ষম।

বয়সবৈষম্যবাদ সংক্রান্ত সক্রিয়তা তত্ত্বে বলা হয়েছে, যখন প্রবীণেরা তাদের সামাজিক ভূমিকা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করে তখন তারা নিজেদেরকে কোথাও যেন হারিয়ে ফেলার বেদনায় ভুগতে থাকেন। তারা নিজেদের 'বহিষ্কৃত' ভেবে মনে মনে আহত হন এবং নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেন। কাজেই প্রবীণরা যাতে মানসিক শক্তি হারিয়ে দুর্বল না হন এবং তারা যাতে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারেন সেজন্য তাদেরকে বরং অবসর গ্রহণের বিপরীত কাজটি করতে হবে অর্থাৎ তারা অবশ্যই পুনরায় কর্মজগতে অনুপ্রবেশ করবেন।

সক্রিয়তা তত্ত্বের প্রবক্তারা আরও বলেন, প্রবীণেরা যদি সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কাজকর্মে সক্রিয় থাকেন এবং সমাজের আর সবার সঙ্গে সামাজিক মেলামেশায় বা মিথস্ক্রিয়ায় রত থাকেন তবে তারা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে সুস্থ থাকবেন।

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

সক্রিয়তা তত্ত্ব

ব্লাউ (১৯৭৩) বলেন, প্রবীণেরা যতই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ভূমিকা ও কাজকর্মে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবেন ততই তারা তাদের পরিত্যক্ত মূল পেশা বা কাজকর্ম হারানোর বেদনাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন।

সক্রিয়তা তত্ত্বের প্রবক্তারা স্বীকার করেন, ৭০ বছর বয়সি ব্যক্তি হয়তো তার ৪০ বছর বয়সের মতো অতটা যোগ্যতা নিয়ে কাজ করতে পারবে না। তবে তারা মধ্যবয়সি লোকদের মতোই সিনিয়র নাগরিক। এ প্রবীণদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিনযাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

সক্রিয়তা তত্ত্বকে কখনো Substitution বা বিকল্প তত্ত্ব নামেও আখ্যা দেওয়া হয়। কেননা এ তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, মানবজীবনের কাজকর্ম সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। অতএব, যুব বা মধ্যবয়সিদের মতো প্রবীণেরাও তাদের কাজকর্মের ধরনে পরিবর্তন আনবেন এবং নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন- এটাইতো স্বাভাবিক। তারা বলেন, প্রবীণ ব্যক্তি ও সমাজ একে অপর থেকে প্রত্যাহার করে না। প্রবীণদের উচিত তাদের মধ্যবয়সি সময়ের কাজকর্মে রত থাকা এবং সমাজের একজন পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করা।'

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

উপসংস্কৃতি তত্ত্ব

আমেরিকান সমাজে অবসর গ্রহণকারী প্রবীণদের অনেকেই একত্রে Retirement Communities বা বৃদ্ধাশ্রমে বসবাস করছেন এবং তারা সমাজের অন্যান্য বয়সি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। তারা তাদের প্রবীণ জীবনের সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন দাবি ও অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছেন। বস্তুত এসব প্রবীণ একটি সংখ্যালঘু সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং তারা প্রবীণ-জীবনপ্রণালি নির্ভর এক ধরনের উপসংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। প্রবীণদের সামাজিক গোষ্ঠীতে নতুন নতুন সদস্য বেড়ে চলেছেন। উপসংস্কৃতি তত্ত্বে বলা হয়, প্রবীণরা এ জাতীয় 'প্রবীণ-সামাজিক গোষ্ঠীতে' সমবয়সি নতুন বন্ধুবান্ধব খুঁজে পান, কখনো বা পুরানো বন্ধুকে আবিষ্কার করেন এবং কর্মস্থলের অনেক সহকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। এতে তাদের স্ব-স্ব জীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সুযোগ ঘটে। এ তত্ত্বে আরও বলা হয়, এভাবে প্রবীণেরা উপসংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে মানসিক পরিতৃপ্তি নিয়ে বসবাস করতে পারেন। এতে তাদের শরীর ও মন অধিকতর ভালো থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় নতুন প্রবীণেরা এ ধরনের উপসংস্কৃতি গোষ্ঠী জীবনে যোগ দিতে উৎসাহবোধ করবে। কারণ বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তি প্রবীণে রূপান্তরিত হবেন তিনি তার সামনে প্রবীণদের একটা সুশৃঙ্খল সামাজিক গোষ্ঠী জীবন দেখলে তাতে যোগ দিতে হয়তো তেমন অনীহা দেখাবেন না। এ ধরনের উপসংস্কৃতিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি তখন স্বাভাবিক বয়োবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অংশে রূপ নেবে।'

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বিনিময় তত্ত্ব

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিনিময় তত্ত্বটি জরাবিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞান থেকে ধার করে তা প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। সামাজিক বিনিময় তথা মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়-

১. ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী চায় স্বল্প খরচে বা স্বল্প শ্রমে অধিক লাভবান বা অধিকমাত্রায় পুরস্কৃত হতে। অর্থনীতির ভাষায় বলা হয়- Minimum cost, Maximum satisfaction.

২. ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কারও সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় সম্মত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেটিকে লাভজনক মনে করে। এ লাভকেবলই যে আর্থিক বা বস্তুগত তা নয়, অবস্তুগত লাভও হতে পারে। যেমন- শ্রদ্ধাভক্তি, সম্মান-স্বীকৃতি, মর্যাদা অর্জন ইত্যাদি।

৩. যার ওপর অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নির্ভর করে সে বেশি ক্ষমতা সঞ্চয় করে। অর্থাৎ নির্ভরশীলরা ক্ষমতা হারায় বা তাদের ক্ষমতার মাত্রা কমে যায়।

৪. মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগায় যখন সে বর্তমান মিথস্ক্রিয়ার ফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে।

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বিনিময় তত্ত্ব

বস্তুত সামাজিক বিনিময় সম্পর্কে জর্জ হোমান্স (১৯৬১) এবং পেটার ব্লাউ (১৯৬৪) একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদান করেন। জেমস ডাউড (১৯৭৫, ১৯৮০) বয়োবৃদ্ধির তত্ত্ব নির্মাণে তা ব্যবহার করেছেন।

বিনিময় তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পুরস্কার পাওয়া বা লাভবান হওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয় সে ক্ষমতা হারায় এবং অন্যজন ক্ষমতা অর্জন করে। "বস্তুত সামাজিক ভাব বিনিময়ের ভারসাম্যহীনতা থেকে ক্ষমতার উৎপত্তি।" (Barrow P.-61)

আর্থিক লেনদেন বা বিনিময়ের চেয়ে সামাজিক বিনিময় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক বিনিময়ে মনস্তাত্ত্বিক তৃপ্তি ও প্রয়োজন মেটানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত। বিনিময় তত্ত্বানুযায়ী বলা হয়, "সমাজজীবন হচ্ছে একজনের সঙ্গে অন্যজনের এমন একটা বিনিময় ধারা, যেক্ষেত্রে একজন অন্যজন থেকে ক্ষমতা এবং মর্যাদার ভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ অর্জন করে বা নিজের ক্ষমতা এবং মর্যাদার ভাণ্ডার থেকে কিছু অংশ অন্যকে দিয়ে দেয়।" (Barrow P.-61)

বয়সবৈষম্যবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

বিনিময় তত্ত্ব

ডেভিড মার্টিন (David Martin) হচ্ছেন প্রথম জরাবিজ্ঞানী যিনি প্রবীণদের সমস্যা পাঠে বিনিময় তত্ত্বটির ব্যবহার করেন। পরিবার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের ধরন গবেষণায় তিনি বিনিময় তত্ত্বের সাহায্য নেন।

বয়সবৈষম্যবাদ ব্যাখ্যায় বিনিময় তত্ত্বের ব্যাপক ব্যবহারের পক্ষপাতী জেমস ডাউড (James Dowd)। প্রবীণেরা সমাজ থেকে কেন অবসর গ্রহণ করেন, তা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জেমস ডাউড বিনিময় তত্ত্বের ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। তিনি যুক্তি দেন,

প্রবীণেরা সমাজের সঙ্গে বিনিময় প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে স্বীয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং একজন প্রবীণ বার্ধক্যজনিত কারণে ক্ষমতা ও শক্তি হারাতে হারাতে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সর্বশেষ যে ক্ষমতা ধারণ করতে পারে তা হলো "কারও কথার উত্তর দেওয়ার নিম্নতম ক্ষমতা।"'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১৩ বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ

বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ

আমাদের সমাজে প্রবীণদের প্রতি বৈষম্যমূলক চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ করি।

প্রবীণদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ হলো-

প্রবীণদের অনুৎপাদনশীল, অক্ষম, দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত মনে করা;

চিন্তাচেতনায় সেকেলে, প্রাচীনপন্থি এবং পরিবর্তন বিমুখ মনে করা;

প্রবীণরা আজ আছেন, কাল নেই, তারা মৃত্যুর কাছাকাছি- তাদের দিন শেষ। তাই তাদের জন্য আর কিইবা করার আছে- এমন মনোভাব পোষণ করা;

তাদের থেকে আর কিছু পাওয়ার নেই, তারা কেবলই বোঝা। কেননা তাদের কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এমনই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা ইত্যাদি।

বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ

বয়সবৈষম্যবাদের ভিত্তিতে আমাদের সমাজের প্রবীণরা যে বৈষম্যের শিকার সেটি বিভিন্ন দিক থেকেই দেখা যায়। জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর সামাজিক উদ্যোগের মধ্যে এ বৈষম্য তথা সামাজিক বঞ্চনা পরিলক্ষিত হয়। সংগতকারণে সারাবিশ্বে শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়ে আসছে। বাজারে নানা ধরনের শিশু খাদ্য পাওয়া যায়। শিশু খাদ্যের জন্য আলাদা দোকানও আছে সর্বত্র সব দেশে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে খাবার মেন্যুতে যেসব আইটেম থাকে তন্মধ্যে কিশোর-যুবকদের চাহিদার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে, প্রবীণদের উপযোগী কোনো খাবার যেমন- নরম খাবার, প্রবীণ ডায়াবেটিস রোগীর উপযোগী কোনো খাবার মেন্যুতে থাকে না।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ফ্যাশন জগতে শিশু-কিশোর-যুবকদের চাহিদা প্রাধান্য পাওয়ায় তাদের উপযোগী নানা ধরনের ডিজাইনের পোশাক লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে, প্রবীণদের বিষয়টি আলাদা। বেশি উজ্জ্বল রং প্রবীণদের জন্য পরিত্যাজ্য। মলিন, অনুজ্জ্বল রং-ই যেন প্রবীণদের প্রতীক। কোনো প্রবীণ ব্যক্তি উজ্জ্বল রঙের হাল-ফ্যাশনের পোশাক পরলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়।

বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ

সাধারণত মধ্যবয়সি বা প্রবীণ পরিবারপ্রধানের জন্য বাড়ির উৎকৃষ্ট ঘর বা রুমটিই বরাদ্দ থাকে। কিন্তু দারিদ্র্যের কশাঘাতে গ্রাম অঞ্চলে প্রবীণ পিতামাতা থেকে যখন সন্তান-সন্ততি পৃথক হয়ে যায় তখন তারা আর্থিক সংকট ও শারীরিক দুর্বলতাহেতু নতুন করে ঘর তৈরি করতে অথবা মেরামত করতে না পারায় জীর্ণ কুটিরেই প্রবীণরা বাস করতে বাধ্য হন।

শিশু রোগতত্ত্ব বা Paediatrics-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে শিশু হাসপাতাল ও মা-শিশুর জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র বা প্রসূতি সদন বা হাসপাতাল। পক্ষান্তরে, প্রবীণদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা নেই। অথচ এমন কিছু রোগব্যাধি রয়েছে যার দ্বারা প্রবীণরাই বেশি আক্রান্ত হন এবং প্রবীণদের অনেকেই দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত। প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ দান করলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র বা নিম্নবিত্তের অধিকারী। আর তাই অধিকাংশ প্রবীণই দরিদ্র বা নিম্নবিত্তের অধিকারী। এদের অধিকাংশই কৃষি, মজুর, ভাগচাষি বা প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক। স্বনিয়োজিত কৃষি পেশায় অবসর গ্রহণ বলতে কিছু নেই, নেই অবসর ভাতা। তারা যতদিন পারেন কাজ করতে বাধ্য হন। রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ এদের নিত্যসঙ্গী।

শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ হলো একটি আজীবন প্রক্রিয়া। অথচ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রবীণদের তুলনায় অন্য বয়সীরা বেশি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

বয়সবৈষম্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যসমূহ

মহিলা-পুরুষ সব প্রবীণকেই ব্যক্তিগত বা বেসরকারি কোনো কোনো সংস্থায় কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম মজুরি দেওয়া হয়। অথচ সক্ষম ও কর্মঠ প্রবীণদের মজুরি কম হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই।

পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে প্রবীণদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হলো নির্দিষ্ট একটি বয়সে তাদের বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা। অবশ্য এর পিছনে নানা যুক্তি দাঁড় করানো হয়।

কয়েক জেনারেশনের পরিবারে প্রায়ই দেখা যায়, পারিবারিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবীণ সদস্যদের মতামত নেওয়া হয় না। এমনকি তাদের অসাক্ষাতেই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়। এতে প্রবীণরা নিজেদের উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে হতাশ হন।

সাধারণভাবে আমাদের সমাজের মানুষ অদ্যাবধি প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু নানা কারণে প্রবীণরা বয়সবৈষম্যবাদ সৃষ্ট কতিপয় সামাজিক বঞ্চনার শিকার। অতএব, সময়ক্ষেপণ না করে প্রবীণের সমস্যা লাঘবে, বৈষম্য দূর করতে এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১৪ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

আমাদের জীবনের কিছু অনিবার্য অসহায় অবস্থা বিরাজ করে যখন লালন-পালন ও ভরণপোষণের জন্য অপরের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন- শৈশব, বার্ধক্য, মহিলাদের মাতৃত্বকালীন সময়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের কতিপয় সমস্যা রয়েছে, যেগুলো ব্যক্তি নিজের দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য দ্বারা মোকাবিলা করতে অক্ষম। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজের সহায়তা প্রয়োজন। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাই সামাজিক নিরাপত্তা।

'সামাজিক নিরাপত্তা' প্রত্যয়টি ইংরেজি 'Social Security'র বাংলা প্রতিশব্দ। সামাজিক নিরাপত্তাকে সামাজিক সুরক্ষাও বলা হয়। Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English অনুযায়ী, সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ- দরিদ্র, বেকার, রুগ প্রভৃতি শ্রেণির ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রদত্ত অর্থ-সাহায্য।

'সামাজিক নিরাপত্তা' প্রত্যয়টি সম্পর্কে International Labour Organisation-এর বক্তব্য হচ্ছে, "সামাজিক নিরাপত্তা এমন এক ব্যবস্থা, যা বিপন্ন মানুষকে যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ কর্তৃক প্রদান করা হয়, যা স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজের সামর্থ্য ও দূরদর্শিতার দ্বারা নিজেরা এককভাবে কিংবা স্বজনের সাহায্যে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারে না।"

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে Maurice Stack তার 'Meaning of Social Security' গ্রন্থে বলেন, "আধুনিক জীবনের অসুস্থতা, বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়সের নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও পঙ্গুত্বের প্রতিবিধানস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যখন স্বীয় ক্ষমতা এবং দূরদর্শিতার দ্বারা নিজেকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে অপারগ হয়, তখন সমাজ কর্তৃক ব্যবস্থিত প্রতিরক্ষামূলক যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সেসব কর্মসূচিকে বোঝানো হয়।"

চার্লস আই. স্কটল্যান্ড (Charles I. Scottland) লিখেছেন, "অসুস্থতা, বেকারত্ব, রোজগারি ব্যক্তির মৃত্যু, বার্ধক্য অথবা অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে যখন কোনো ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় পতিত হয় এবং নিজে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না তখন তাকে সাহায্য করার জন্য সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে।"

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

মূলত সামাজিক নিরাপত্তা একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। রাষ্ট্র বিপন্ন নাগরিকদেরকে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে। সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে Encylopaedia of Social Work in India-তে প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "সামাজিক নিরাপত্তা বিভিন্ন আকস্মিক বিপর্যয়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশায় ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেয়।"

অতএব বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাদের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন সে অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয় সেসবের সমষ্টিকে সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১৫ সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সামাজিক নিরাপত্তার একটি অন্যতম উপায়। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি গড়ে ওঠে শ্রমিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে। ১৯২৩ সালে কারখানা, রেলপথ, খনি, বন্দর ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের পেশাগত আকস্মিক দুর্ঘটনায় সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন প্রণীত হয়। প্রণীত আইন অনুযায়ী কোনো কর্মচারী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে অথবা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে। বর্তমানে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৫ হাজার টাকা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ পরিমাণ নগণ্য। সুতরাং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত।

সামাজিক নিরাপত্তার একটি অন্যতম উপায় হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গর্ভবতী মহিলাদের সন্তান জন্মদানের আগে ও পরে ছুটি ভোগ করা এবং এ সময় প্রয়োজনীয় আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রাপ্তি। ২০০৬ সালে প্রণীত 'বাংলাদেশ শ্রম আইন' অনুযায়ী কর্মরত মহিলাদের ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান থাকলেও এ বিধান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সরকারকে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

সামাজিক নিরাপত্তার আরেকটি উপায় হলো চাকরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা। চাকরিজীবীদের অবসর গ্রহণের পর আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯২৩ সালে প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনটি প্রণীত হয়। এ আইনের বিধান অনুযায়ী চাকরিজীবীদের অবসর ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক প্রভৃতি আর্থিক সুবিধাদান এ আইনের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, এ আইনটির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। সরকারকে এ ব্যাপারে তদারকি করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার আরেকটি উপায় হলো চাকরিজীবীদের অবসর ভাতা প্রদান। নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রমের কিংবা নির্দিষ্ট চাকরিকালের (কমপক্ষে একটানা দশ বছর) পর সরকারি চাকরিজীবিগণ বাকি জীবন মাসে মাসে অবসর ভাতা পেয়ে থাকেন। অবসর ভাতাভোগীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করলে আজীবন স্বামীর প্রাপ্য অবসর ভাতা পাবেন। কোনো কোনো আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেও অবসর ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সকল বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অবসর ভাতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

বাংলাদেশে সকল সরকারি কর্মচারীকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা চিকিৎসা ভাতা ও বাড়ি ভাড়া ভাতা হিসেবে দেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসবের কোনো বালাই নেই। সরকারকে এ ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

যৌথ বিমা সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পরিবারের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম। চাকরিকালে কর্মচারীদের যৌথ বিমা তহবিলে একটি নির্দিষ্ট হারে টাকা জমা দিতে হয়। চাকরিরত অবস্থায় কোনো কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার পরিবার কর্মচারীর বিমা তহবিলে জমাকৃত টাকার দ্বিগুণ পেয়ে থাকে। বেসরকারি পর্যায়েও বিষয়টির বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমাদের সমাজে যারা ভূমিহীন, বিত্তহীন, উদ্বাস্তু এবং বার্ধক্যের কারণে যারা দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম সরকার তাদের জন্য ১৯৯৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে বয়স্কভাতার ব্যবস্থা করেছে। দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ জন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, যাদের বার্ষিক আয় সর্বসাকল্যে অনূর্ধ্ব ৩ হাজার টাকা তেমন ৫ জন পুরুষ এবং ৫ জন মহিলাকে বয়স্কভাতা প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থার আওতায় সকল অক্ষম ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাধারণ অর্থে বয়স্ক ভাতা বলতে বয়স্ক ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপকে বোঝায়।

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল। কাজেই সকল অক্ষম বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য ভাতার ব্যবস্থা কিংবা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় প্রতিবছর অসংখ্য মহিলা প্রতিবন্ধী হচ্ছে। তাদের ও অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে 'এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম' চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির বাস্তবভিত্তিক সফল কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে।

ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০২ সাল হতে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সহজ শর্তে সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। এ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।

সম্পূর্ণভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জীবনধারণে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়। এ ভাতার পরিমাণ নগণ্য। ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার উপায়

সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে কিছু শিশুকল্যাণ কার্যক্রম চালু আছে। যেমন- শিশু সদন, ছোটমণি নিবাস এবং প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে সারাদেশে আরও শিশু সদন, ছোটমণি নিবাস এবং প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

আমরা জানি, শিক্ষা একটি মৌলিক প্রয়োজন ও অধিকার। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন- অবৈতনিক শিক্ষা, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, নিরাপত্তা ইত্যাদি। এ ব্যবস্থাগুলো চালু রাখতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

[ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১; ব. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

লিজা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বেঁচে থাকার তাগিদে সে ব্যবসায়ী সবুজ সাহেবের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। সবুজ সাহেবরা যা খেত লিজাকে তা খেতে দেওয়া হতো না। সবুজ সাহেবের স্ত্রী লিজার সাথে ভালো ব্যবহার করে না বরং মাঝে মাঝে গালমন্দ ছাড়াও তাকে প্রহার করে থাকে।

ক. জাতি বর্ণপ্রথা কী?

খ. সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত অসমতাটি আমাদের সামাজিক উন্নতির অন্তরায়-তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

[ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; চ. বো. ১৯;সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

ব্যাংকার দম্পতি মিসেস শারমিন ও মি. সাজেদ সকালে একসাথে অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। অফিস শেষে মিসেস শারমিন বাসায় ফিরে সন্তানদের দেখাশুনা, রান্নার তদারকি, সংসারের যাবতীয় কাজে ব্যস্ত থাকেন। মি. সাজেদ অফিস শেষে ক্লাবে যান অথবা টিভি দেখেন, বিশ্রাম নেন। মি. সাজেদ মনে করেন সাংসারিক এসব দায়িত্ব পালন তার কাজ নয়। বিশ্রামহীন, বিনোদনহীন মিসেস শারমিন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। অফিস ও সাংসারিক দায়িত্ব কোনোটাই ঠিকভাবে পালন করতে পারছেন না।

ক. সামাজিক অসমতা কাকে বলে?

খ. 'সামাজিক স্তরবিন্যাস সর্বত্র লক্ষণীয়'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে সামাজিক অসমতার কোন ধরন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের অবস্থা সমাজ প্রগতির অন্তরায়'- সুচিন্তিত মতামত দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ক. শ্রেণি কী?

খ. এস্টেট প্রথা বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে বিষয়টি সামন্তযুগে বিদ্যমান ছিল বিষয়টির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত একটি ধরন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান- যুক্তির সাথে তোমার মতামত দাও।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা

টপিক – ১৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. 'Strata' শব্দের অর্থ কী? [সকল বোর্ড, '১৭]

ক. মাটির স্তর খ. পানির স্তর গ. বায়ুর স্তর ঘ. সামাজিক স্তর.

২. Strata প্রত্যয়টি দ্বারা সমাজবিজ্ঞানে কী বোঝায়?

ক. মানুষের উঁচু-নিচ শ্রেণি খ. প্রতিষ্ঠানের উঁচু-নিচ শ্রেণি

গ. ক্ষমতার উঁচু-নিচ শ্রেণি ঘ. ধর্মের উঁচু-নিচ শ্রেণি

৩. সমাজের ক্রমোচ্চ অসমতাকে কী বলে?

ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. সামাজিক সমস্যা

গ. সামাজিক স্তরবিন্যাস ঘ. সামাজিক গতিশীলতা

৪. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন কয়টি?[সকল বোর্ড '২৩]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

৫. পৃথিবীর প্রাচীনতম শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কোনটি?

ক. দাস ব্যবস্থা খ. সামন্ত ব্যবস্থা গ. জাতি-বর্ণ প্রথা ঘ. কৃষি ব্যবস্থা

৬. দাসপ্রথার পূর্ণ বিকাশ ঘটে কোন সভ্যতায়?

ক. গ্রিক ও রোমান খ. ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়

গ. মিশরীয় ঘ. রোমান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. দাসদের উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন কে?

ক. মার্ক্স খ. ওয়েবার গ. নিউটন ঘ. অ্যারিস্টটল

৮. দাস প্রথাকে সমর্থন করেছেন কে?

ক. মার্ক্স খ. অ্যারিস্টটল গ. ওয়েবার ঘ. ডুর্খেইম

৯. দাসব্যবস্থায় কয়টি শ্রেণি বিদ্যমান? [সকল বোর্ড '২২]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৬

১০. দাস সমাজে কোন দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব সুস্পষ্ট?

ক. দাস ও দাসপ্রভু খ. দাস ও জমিদার

গ. জমিদার ও ভূমিহীন ঘ. দাস ও পুঁজিপতি

১১. প্রতিটি দাস কার অধীন ছিল?[সকল বোর্ড '১৬]

ক. মনিবের খ. পিতা-মাতার গ. সরকারের ঘ. সামাজিক সংগঠনের

১২. সেবা ও রক্ষা নামক সামাজিক চুক্তি ছিল- [সকল বোর্ড '১৬]

ক. আদিম যুগে খ. পশুপালন যুগে গ. দাস যুগে ঘ. সামন্ত যুগে

THANK YOU